দ্বিতীয় অধ্যায়

ইবাদাত

প্রিয় শিক্ষার্থী, এই অধ্যায় থেকে তুমি দুটি অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। বেশ কিছু কাজ করার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে করতে তুমি এই অধ্যায়ের মূল শিক্ষা আত্মস্থ করতে পারবে। তবে অধ্যায়ের পাঠে প্রবেশের পূর্বেই একটু মাথা খাটিয়ে চিন্তা করে দেখো তো ইবাদাত সম্পর্কে তুমি কি কি জানো? ষষ্ঠ শ্রেণিতে কি তুমি ইবাদাত সম্পর্কে কোনকিছু পড়েছিলে বা শিখেছিলে? মনে করার চেষ্টা করে দেখো তো। এব্যাপারে তোমার সহপাঠী বন্ধুদের সহায়তা নাও, প্রয়োজনে শিক্ষকও তোমাদের সহায়তা করবেন। শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে কাজ করতে থাকো, তাহলেই এই অধ্যায় থেকে অনেক নতুন বিষয় জানতে পারবে, শিখতে পারবে আর কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।

ইবাদাত আরবি শব্দ। এর অর্থ আনুগত্য করা, দাসত্ব করা। ইসলামের পরিভাষায় আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় তাঁর প্রেরিত রাসুলের দেখানো পথে জীবন পরিচালিত করাকে ইবাদাত বলে। আল্লাহ মানুষ ও জিন জাতিকে তাঁর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। ইবাদাতের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে শরীয়ত সমর্থিত যেকোনো উত্তম কাজই ইবাদাত। আগের শ্রেণিতে তোমরা ইবাদাতের পরিচয়, তাৎপর্য ও প্রকারভেদ সম্পর্কে জেনেছ। ইসলামের প্রধান কয়েকটি ইবাদাত সম্পর্কে তোমরা পূর্বের শ্রেণিতে জানতে পেরেছ। এখানে আমরা ইসলামের মৌলিক ইবাদাতসমূহের মধ্যে সালাত (নামাজ), সাওম (রোযা) ও যাকাত সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানব।

সালাত

প্রিয় শিক্ষার্থী! পূর্বের শ্রেণিতে তুমি সালাত সম্পর্কে বেশ কিছু বিষয় শিখেছ। আগের শ্রেণির আলোচনার ধারাবাহিকতায় এ শ্রেণিতে পর্যায়ক্রমে তুমি সালাতের তাৎপর্য, উপকারিতা, ফজিলত, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, সালাতের ইমামতি, আযান ও ইকামত সম্পর্কে শিখবে ও প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করবে। এ ছাড়া তুমি সালাতুল বিতর, সালাতুল জুম'আ, সালাতুল জানাযা, সালাতুল 'ঈদাইন, সালাতুত তারাবিহ, মাসবুক ব্যক্তির সালাত, রুগ্ণ ব্যক্তির সালাত, মুসাফিরের সালাত, সালাতের নিষিদ্ধ সময়, সাহু সিজদা সালাত সংশ্লিষ্ট তাসবিহ ও দোয়াসমূহের তাৎপর্য ও মর্ম বাণী, আদর্শ জীবন গঠনে সালাতের ভূমিকা, সালাত আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি নির্বাচিত সূরা ইত্যাদি সম্পর্কে শিখবে ও যোগ্যতা অর্জন করবে। তাহলে এবার মূল আলোচনা শুরু করা যাক।

সালাতের তাৎপর্য

ইমানের পর ইসলামের দ্বিতীয় ভিত্তি বা রুকন হলো সালাত। আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করে দিয়েছেন। মুমিনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বড় ফরয ইবাদাত হলো, সময়মতো পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা। পবিত্র কুরআন এবং হাদিসে সালাতকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করা মুমিনদের ওপর ফরয।' (সূরা নিসা, আয়াত: ১০৩) কুরআন মাজিদে প্রায় ৮২ স্থানে আল্লাহ তা'আলা সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন- 'আপনি আপনার পরিবারের লোকদেরকে সালাতের আদেশ দিন এবং এর ওপর অবিচল থাকুন।' (সূরা: ত্বাহা, আয়াত: ১৩২)

সালাতের ক্ষেত্রে আমরা সর্বোচ্চ সাবধানতা অবলম্বন করব। নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায়ে সচেষ্ট হবো। মহান আল্লাহ সফল মুমিন ও জান্নাতুল ফিরদাউসের বাসিন্দাদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন, 'আর যারা নিজেদের সালাতের ব্যাপারে যত্নবান থাকে।' (সূরা আল্-মুমিনুন, আয়াত: ৯)

ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত আদায় না করা মহা অপরাধ ও বড় গুনাহ। আন্তরিক সদিচ্ছা সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুলে যাওয়া কিংবা ঘুমিয়ে পড়ার কারণে সালাত ছুটে গেলে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে সালাতের কাযা আদায় করতে হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'ঘুমের কারণে যার সালাত ছুটে গেছে সে যেন জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে সালাত আদায় করে নেয়।' (মুসলিম)

সালাত বা নামাজ শব্দটির একটি অর্থ হলো 'সংযোগ'। সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে আমরা নিজেদের সম্পর্ক স্থাপন করি। নানা কারণে মাঝে মাঝে আমরা নিজেদেরকে অসহায় অনুভব করি। নিজেকে নিরুপায় ও একাকী মনে করার কোনো কারণ নেই। মহান আল্লাহ অবশ্যই আমাদের পাশে আছেন। যে কোনো সময় আমরা সালাতে দাঁড়িয়ে, তাঁর সামনে মাথা নত করে বুকের ভেতর জমে থাকা সব দুঃখ, কষ্ট, অপমান, হতাশা উজাড় করে দিতে পারি। তিনি অবশ্যই তা শুনবেন। তিনি সব কিছু শোনেন। আমরাই বরং তাঁর সাথে সংযোগ স্থাপন করি না। আল্লাহর নিকট বান্দার আনুগত্য ও বিনয় প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হচ্ছে সালাত। সালাতের মাধ্যমেই বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে বেশি নৈকট্য লাভ করে। সালাত হচ্ছে মুসলিম ব্যক্তির অন্তরের প্রশান্তি এবং তার সাহায্যকারী। সালাত বিপদ-আপদে আত্মাকে শক্তিশালী করে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন 'তোমরা ধৈর্য এবং সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো।' (সূরা আল্-বাকারা, আয়াত: ১৫৩)

সালাতের উপকারিতা

সালাত আল্লাহর বিধান। এই বিধানটি মানুষের কল্যাণের জন্য দেওয়া হয়েছে। সালাত আদায়ের মাধ্যমে মানুষ বিভিন্ন উপকার পেতে পারে। যেমন–

শারীরিক উপকারিতা: সালাত এমন একটি ইবাদাত যার মাধ্যমে শরীর চর্চার অধিকাংশ উপকারিতাই পাওয়া যায়। যথাযথভাবে সালাত আদায়ের মাধ্যমে ফুসফুস, মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ড, মাংসগ্রন্থি, ঘাড় ইত্যাদি অঙ্গের রোগের উপকার পাওয়া যায়। স্নায়ুবিক দুর্বলতা ও জোড়ায় ব্যথ্যা সারানোর জন্য চিকিৎসকরা সালাত আদায়ের পরামর্শ দেন। এ কথা সত্য যে, সালাতে সিজদার সময় মস্তিষ্কতন্ত্রী, চোখ ও মাথাসহ অন্যান্য অঙ্গে রক্তপ্রবাহ পরিমিত পর্যায়ে থাকে। ফলে চোখের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় ও মস্তিষ্ক প্রখর হয়। প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আমাদের শরীরকে সচল ও কার্যকর রাখা নিশ্চিত করে। আলস্য বা কর্মবিমুখতা দূর হয়। তবে সালাতের মূল উদ্দেশ্য মহান আল্লাহর প্রতি আত্ম-নিবেদন।

মানসিক উপকারিতা: বর্তমানে মানুষের অশান্তির মূল কারণ হলো মানসিক অস্থিরতা। এই অস্থিরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে সারা বিশ্বে গবেষণা হচ্ছে। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ধ্যান (Meditation) কে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। সালাত হলো এক উন্নতমানের ধ্যান (Meditation)। কেউ যদি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে আল্লাহ আমাকে দেখছেন ও আমার সব অবস্থা জানেন, তাহলে তার কোনো প্রকার হতাশা থাকতে পারে না। এ ছাড়া মহানবি (সা.) যখন কোনো পেরেশানিতে ভুগতেন তখন তিনি হযরত বেলাল (রা.)-কে বলতেন 'হে বেলাল, সালাতের ব্যবস্থা করে (আযান দিয়ে) আমাদের শান্তি দাও।' (আবু দাউদ) বস্তুত মানুষের শরীর ও মন এক অপরের পরিপূরক। সালাত আদায়ের মাধ্যমে মন উৎফুল্ল থাকে।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপকারিতা: মসজিদ হলো মহান আল্লাহ তা'আলার ঘর, যেখানে দৈনিক পাঁচবার সম্মিলিতভাবে সালাত আদায় করা হয়। সেখানে ধনী-গরিব কোনো ভোদাভেদ থাকে না। সকলে স্ব স্ব পদমর্যাদা ভুলে মহান আল্লাহর দরবারে হাজিরা দেয়। একে অপরের খোঁজ-খবর নিয়ে সুখে দুঃখে পাশে দাঁড়ায়। ফলে মুসলিম সমাজের বন্ধন সুদৃঢ় হয়। সালাত আদায়ের মাধ্যমে ইসলামি সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। আর নিয়মিত সালাত আদায় করলে সমাজ হতে অপসংস্কৃতি দূর হয়।

সালাতের মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য

ইসলাম আমাদের দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা। আর এ দ্বীনের ভিত্তি হলো সালাত। সালাত সকল ইবাদাতের প্রধান। মুমিনের জন্য সালাত মিরাজ স্বরূপ। বস্তুত সালাতের মাহাত্ম্য ও উপকারিতা অশেষ। সালাত আদায়ের মাধ্যমে অগণিত কল্যাণ লাভ করা যায়।

সালাতে রয়েছে দুনিয়া আখিরাতের মহা সফলতা। আল-কুরআনে বিনয় ও নম্রতার সাথে সালাত আদায়কারী মুমিনদের সফলকাম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। (সূরা আল-মু'মিন, আয়াত: ১-২)। আবার অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে এবং তার রবের নাম স্মরণ করে ও সালাত কায়েম করে।' (সূরা আল-আ'লা, আয়াত: ১৪-১৫)

সালাত অশ্লীলতা ও অন্যায় থেকে বাঁচার রক্ষাকবজ। কেননা সালাত কায়েমকারী নিজের মাঝে আল্লাহভীতি অনুভব করে যা তাকে সকল অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ

অর্থ: 'নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।' (সূরা আল-'আনকাবূত, আয়াত: ৪৫)

সালাত আদায়ের মাধ্যমে বান্দা দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা লাভ করে। যেমন মহানবি (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি সকালের (ফজরের) সালাত আদায় করল সে আল্লাহর জিম্মায় (নিরাপত্তায়) চলে গেল।' (মুসলিম)

সালাত মুমিনদের জন্য দুনিয়ার জীবনে দৃঢ়তা ও স্থিরতা আনে। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে অতিশয় অস্থিরচিত্তরূপে। যখন কোনো মন্দ তাকে স্পর্শ করে তখন সে হা-হুতাশ করে। আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে, সে অতি কৃপণ হয়। তবে সালাত আদায়কারীগণ ব্যতীত। যারা তাদের সালাতে সদা প্রতিষ্ঠিত।' (সূরা আল-মা'আরিজ, আয়াত: ১৯-২৩)

সালাতের মধ্যে রিজিকের প্রশস্ততা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'এবং আপনার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দিন আর তাতে অবিচল থাকুন, আমি আপনার নিকট কোনো রিযিক চাই না, আমিই আপনাকে রিযিক প্রদান করি এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।' (সূরা ত্বা হা, আয়াত: ১৩২) ইবনে কাসীর (রহ.) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, যদি সালাত প্রতিষ্ঠা করো তাহলে এমনভাবে তোমার নিকট রিযিক আসবে, যার ধারণাও তুমি করতে পারবে না।

সালাত হলো উত্তম যিকির। কারণ, সালাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এর সম্পূর্ণটাই আল্লাহর যিকির। মহান আল্লাহ তাঁর যিকিরের জন্য সালাত প্রতিষ্ঠার আদেশ দিয়েছেন। এর মাধ্যমে আত্মিক ও মানসিক প্রশান্তি লাভ করা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

অর্থ: 'জেনে রাখো! আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।' (সূরা আর-রা'দ, আয়াত : ২৮)
মহান আল্লাহ বলেন, আমার স্মরণের লক্ষ্যে সালাত কায়েম কর (সূরা ত্বাহা, আয়াত : ১৪)

হাদিসে এসেছে মহানবি (সা.) বিলাল (রা.) কে বলেন, 'উঠো বিলাল এবং আমাদেরকে সালাতের মাধ্যমে প্রশান্তি পৌঁছাও।' (মুসনাদে আহমদ)

সালাত সর্বোত্তম আমল। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) মহানবি (সা.) কে জিজ্ঞাসা করেন: সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বলেন, 'সময়মতো সালাত আদায় করা।' (বুখারি ও মুসলিম)

সালাত হিফাযত বা সংরক্ষণকারীর জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হলো যে, তিনি তাকে জান্নাত দান করবেন। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ বান্দার ওপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন, যে তা হিফাযত করল তার জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হলো যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।' (আবু দাউদ অন্য হাদিসে মহানবি (সা.) বলেন, 'যে সালাতের হিফাযত করল, সালাত তার জন্য জ্যোতি, প্রমাণ ও কিয়ামতের দিন মুক্তির কারণ হবে।' (মুসনাদে আহমদ)

সালাত আদায়ের মধ্য দিয়ে আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করা যায়। ইহা বান্দা ও তার প্রতিপালকের মধ্যে সম্পর্ক গড়ার মাধ্যম। মহান আল্লাহ বলেন– 'আর সিজদাহ কর ও (আমার) নিকটবর্তী হও।' (সূরা আল আলাক, আয়াত: ১৯)

মহানবি (সা.) বলেন, 'বান্দা স্বীয় রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় সিজদাহ অবস্থায়। অতএব, তোমরা সিজদায় বেশি বেশি দোয়া করো।' (মুসলিম)

সর্বোপরি, সালাতের মাহাত্ম্য ও অপরিসীম। সালাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসা ও নৈকট্য লাভ করা যায়। এর মাধ্যমে সকল প্রকার অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে দূরে থেকে অন্তরের প্রশান্তি লাভ করা যায়। এটি পাপমুক্তির উপায়। এক কথায়, সালাত দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও সফলতা লাভের মাধ্যম।

সালাত আদায়ে একনিষ্ঠতা ও একাগ্রতা

আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের অন্যতম উপায় হচ্ছে একাগ্রতার সাথে সালাত আদায় করা। সালাতের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নিকট তার আবেদন নিবেদন পেশ করে তৃপ্তি লাভ করতে পারে। আর আল্লাহ তা'আলাও বান্দার আবেদন গ্রহণ করে থাকেন। তাহলে বান্দাকে অবশ্যই বিনয়ের সাথে সালাতে দাঁড়াতে হবে। যেমন: কুরআন মাজিদে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ۝

অর্থ: 'তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াবে।' (সূরা আল বাকারা, আয়াত: ২৩৮)

নামায অবস্থায় বান্দার মন এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে অথচ মুসল্লি টেরও পায় না। কারণ, মানব মন কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করতে অভ্যস্ত। গভীর মনোযোগের সাথে কোনো কাজে নিয়োজিত না হলে মন স্থির থাকে না। তা ছাড়া শয়তান হচ্ছে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। সে বান্দার সকল ইবাদাত বিশেষত সালাত নষ্ট করার জন্য বিভিন্ন বিষয় মনের মধ্যে হাজির করে দেয়। তাই বান্দার মন সালাতে ঠিক থাকে না। এজন্যই বান্দাকে খুশু খুযু (বিনয় ও একাগ্রতা) ও মনের স্থিরতার সাথে সালাত আদায় করতে হবে। যেমন: পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন–

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝

অর্থ: 'মুমিনগণ অবশ্যই সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়ী।' (সূরা আল-মু'মিনুন, আয়াত: ১,২)

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের রাকাআতসমূহ

ফজর: ফজরের সালাত মোট ৪ রাকাআত। এর মধ্যে ২ রাকাআত সুন্নত এবং ২ রাকাআত ফরয। প্রথমে সুন্নত আদায় করতে হয় এবং তারপরে ফরয আদায় করতে হয়। মনে রাখবে, ফজরের সুন্নত সালাতের গুরুত্ব অন্যান্য ওয়াক্তের সুন্নত সালাতের চেয়ে অনেক বেশি।

যোহর : যোহরের সালাত মোট ১০ রাকাআত। আর এগুলো হলো– ৪ রাকাআত সুন্নত মুয়াক্কাদাহ– যা সাধারণত এ ওয়াক্তের ফরয সালাতের পূর্বে আদায় করতে হয়, তারপর ৪ রাকাআত ফরয সালাত আদায় করতে হয় এবং ফরযের পরে আরো ২ রাকাআত সুন্নত সালাত আদায় করতে হয়।

আসর: আসরের সালাত ৪ রাকাআত-যা ফরয। তবে এ ফরযের পূর্বে ৪ রাকাআত সুন্নত সালাত আদায় করা অনেক সাওয়াবের কাজ। তবে এটি না করলে কোন গুনাহ নেই।

মাগরিব: মাগরিবের সালাত মোট ৫ রাকাআত। এর মধ্যে ৩ রাকাআত ফরয এবং ফরয শেষে অনতিবিলম্বে ২ রাকাআত সুন্নত মুয়াক্কাদাহ সালাত আদায় করতে হয়।

এশা: এশার সালাত মোট ৬ রাকাআত। প্রথমে ৪ রাকাআত ফরয সালাত আদায় করতে হয়। তারপর ২ রাকাআত সুন্নত সালাত আদায় করতে হয়। এশার ফরযের পূর্বেও ৪ রাকাআত সুন্নত সালাত আদায় করা হয়, যা না করলে কোন গুনাহ নেই, করলে সাওয়াব হয়।

এক নজরে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের রাকাআতসমূহ				
ওয়াক্ত	সুন্নাত (মুয়াক্কাদাহ)	ফরয	সুন্নাত (মুয়াক্কাদাহ)	ওয়াজিব
ফজর	২ রাকাআত	২ রাকাআত		
যোহর	৪ রাকাআত	৪ রাকাআত	২ রাকাআত	
আসর		৪ রাকাআত		
মাগরিব		৩ রাকাআত	২ রাকাআত	
এশা		৪ রাকাআত	২ রাকাআত	৩ রাকাআত (বিতর সালাত)
মোট ফরয সালাত		= ১৭ রাকাআত		

জামাআতে সালাত আদায়

জামাআত শব্দটি আরবি। এর শাব্দিক অর্থ হলো একত্রিত হওয়া, জনসমাবেশ, সমবেত হওয়া ইত্যাদি। শরিয়তের দৃষ্টিতে নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত স্থানে মুসলিম সম্প্রদায়ের ইমামের পেছনে সমবেত হয়ে সালাত আদায় করাকে জামাআতে সালাত আদায় বলা হয়।

জামাআতে সালাত আদায়ের মাহাত্ম ও গুরুত্ব

ইসলামে জামআত বা সমবেতভাবে সালাত আদায় করার গুরুত্ব অপরিসীম। পবিত্র কুরআন ও হাদিসের বিভিন্নস্থানে জামাআতবদ্ধ হয়ে সালাত আদায়ের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ۝

অর্থ: 'তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু করো।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ৪৩)

এখানে মূলত জামাআতে সালাত আদায় করাকে নির্দেশ করা হয়েছে। আমরা যদি রাসুলে করিম (সা.) এর জীবনের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো তিনি কখনো জামাআত ছাড়েননি। জামাআতে সালাত আদায়ের ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে মহানবি (সা.) বলেছেন, 'জামাআতে সালাত আদায়ের মাহাত্ম্য একাকী সালাত আদায়ের চেয়ে ২৭ গুণ বেশি।' (বুখারি ও মুসলিম)

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুল (সা.) বলেছেন, 'সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা সেদিন আরশের নিচে ছায়া প্রদান করবেন, যেদিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে একজন হলো ঐ ব্যক্তি যার আত্মা মসজিদের সাথে লাগানো সম্পৃক্ত থাকে। অর্থাৎ সালাত ও জামাআতের প্রতি অধীর আগ্রহী ব্যক্তি।' (বুখারি ও মুসলিম) বিশিষ্ট মুসলিম মনীষী সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব (রহ.) পঞ্চাশ বছর সময় ধরে ফরয সালাতে কোন মানুষের ঘাড় দেখেননি। অর্থাৎ তিনি প্রথম কাতারে শামিল ছিলেন। আর ইবনে সামাআহ (রহ.) বলেন, চল্লিশ বছর পর্যন্ত আমার তাকবিরে উলা তথা প্রথম তাকবির ছোটেনি। শুধুমাত্র সে দিন ছাড়া যে দিন আমার মায়ের ইন্তেকাল হয়েছিল। অতএব কখনো কেউ মসজিদে জামাআতে শরিক হতে অপারগ হলে একাকী সালাত আদায় না করে বাসায় পরিবার পরিজনকে সাথে নিয়ে সালাত আদায় করা উত্তম।

জামাআতে সালাত আদায় করার ফলে মুসল্লিদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব, মহব্বত, ঐক্য ও সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। তাই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও অধিক সাওয়াব পাওয়ার আশায় প্রত্যেক মুমিন বান্দার জামাআতে সালাত আদায় করা একান্ত প্রয়োজন।

ইমাম

ইমাম শব্দের অর্থ নেতা। ইমাম সালাত পরিচালনা করেন। জামাআতে সালাত আদায়ের সময় মুসল্লিগণ যাকে অনুসরণ করে সালাত আদায় করে তিনিই ইমাম। ইমামতি করা দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা স্বয়ং নবি করিম (সা.) সারা জীবন করে গেছেন। অতঃপর তাঁর মৃত্যুর পর চার খলীফা তা সম্পাদন করেছেন। মুসলিম সমাজের উত্তম ব্যক্তিরাই সাধারণত এই পবিত্র দায়িত্বটি পালন করে থাকেন। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ইসলামের দ্বিতীয় রোকন। মহান আল্লাহ জামাআতবদ্ধভাবে সালাত আদায় করার আদেশ করেছেন। আর সেই আদেশ ইমাম ব্যতীত বাস্তবায়িত হয় না। মহানবি (সা.)-এর আমলেও প্রত্যেক এলাকায় মসজিদে বা সাময়িক কোনো স্থানে একজন ইমামের নেতৃত্বে সালাত আদায় হতো। উপস্থিত মুসল্লিদের মধ্যে সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তির ইমামতি করাই নিয়ম। তবে সময় মতো উপযুক্ত ইমাম পাওয়া যায় না বলে এখন মসজিদে সুনির্দিষ্ট ইমাম নিয়োগ করা হয়ে থাকে।

ইমামের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইমামতি সাধারণ কোনো পেশা নয়। এর রয়েছে অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য। সেবার মানসিকতা নিয়েই এ পেশায় আত্মনিয়োগ করা উচিত। একজন ইমাম শুধু মসজিদের ইমাম নন, তিনি সমাজেরও ইমাম। তিনি মানুষ, মনুষ্যত্ব ও সমাজ নিয়ে ভাবেন।

ইমামের মূল দায়িত্ব হলো, সালাতে নেতৃত্ব দেওয়া। নামাজের যাবতীয় দিক খেয়াল রাখা একজন ইমামের জন্য অবশ্য কর্তব্য। সালাতে কাতার ঠিক করা। সালাত যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করা। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘তোমাদের কেউ লোকদের ইমামতি করলে সে যেন সালাত সংক্ষেপ করে। কেননা তাদের মধ্যে ছোট বালক, দুর্বল ও অসুস্থ লোক থাকতে পারে।’ (বুখারি)

রাসুলুল্লাহ (সা.) আরো বলেছেন, ‘তোমরা তোমাদের মধ্যকার উত্তম ব্যক্তিকে তোমাদের ইমাম নিয়োগ করবে। কারণ তিনি হবেন তোমাদের পক্ষে তোমাদের প্রতিপালকের প্রতিনিধি।’ (দারাকুতনি) ইমামকে হতে হবে সকলের আস্থাভাজন। মুসল্লিদের সালাত শুদ্ধ হচ্ছে কি না তিনি তা খেয়াল রাখবেন। যারা সালাত পালন করে না, তাদের বুঝিয়ে-শুনিয়ে মসজিদে আনার ব্যবস্থা করবেন। ইমামের সংস্রবে থেকে মুসল্লিরা ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য, সহমর্মিতা ও অন্যান্য নৈতিক গুণ অর্জন করবে।

মুক্তাদি

যারা ইমামের পেছনে দাঁড়িয়ে তাঁকে অনুসরণ করে সালাত আদায় করে তারাই মুক্তাদি। মুক্তাদি ইমামের পেছনে ইকতিদা করবে। মনে মনে এই নিয়ত করবে যে, ‘আমি এই ইমামের পেছনে সালাত আদায় করছি।’ সালাতের যাবতীয় কাজে মুক্তাদি ইমামের অনুসরণ করবে।

মুক্তাদির কর্তব্য

ইকামত হওয়ার সাথে সাথে সালাতে দাঁড়িয়ে যাবে। ফরয সালাতের ইকামত হলে সুন্নাত পড়বে না। নিজ দায়িত্বে কাতার সোজা করবে। সামনের কাতারগুলো আগে পূরণ করবে। কাতারের মধ্যকার ফাঁকা জায়গা না রেখে একে-অপরের সাথে মিলিয়ে দাঁড়াবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- 'যে ব্যক্তি কাতারে মিলিয়ে দাঁড়ায়, আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক রাখেন। আর যে মিলিয়ে দাঁড়ায় না আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।' (আবু দাউদ) দুই কাতারের মাঝে ব্যবধান বেশি রাখবে না। সামনের কাতারে দাঁড়ানোর চেষ্টা করবে। পরে এসে মানুষ ডিঙিয়ে সামনে যাওয়ার চেষ্টা করবে না। ইমামের পেছনে দাঁড়াবে ও তাঁকে অনুসরণ করবে। রুকু, সিজদা, বসা বা উঠা কোনোটাই ইমামের আগে আগে করবে না। সব কাজ ইমামের অব্যবহিত পরে করবে। যদি ইমাম ভুল করেন, তবে নিকটবর্তী মুক্তাদি সংশোধন করে দেবেন। এক্ষেত্রে 'আল্লাহু আকবার' বলে ইমামকে সতর্ক করবেন অথবা ভুল আয়াত শুদ্ধভাবে পড়ে তাকে সাহায্য করবেন।

আযান

আযান আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো ডাকা, আহবান করা, ঘোষণা করা। শরিয়তের পরিভাষায়– নির্ধারিত আরবি বাক্যসমূহের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ে উচ্চকণ্ঠে নামাযে আহবান করাকে আযান বলে। আযান ইসলামের প্রতীক। আযানের ধ্বনি শুনে মুসলমানেরা সালাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে। মুসলমানদের কাছে আযানের গুরুত্ব অপরিসীম। সালাতে আযান ও ইকামত দেওয়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। মুয়াক্কাদা অর্থ যা পালনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

সালাত ফরয হওয়ার পর পবিত্র মক্কা নগরীতে আযান ছাড়াই সালাত পড়া হতো। প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে তথায় মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদে মুসলমানদের সালাতে অংশগ্রহণের জন্য একত্রিত করতে আযানের প্রচলন হয়। আযানের শব্দগুলো অহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত। ইসলামের প্রথম মুয়াযযিন ছিলেন হযরত বেলাল (রা.)। আযানের বহু গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে। মুয়াযযিনের মর্যাদা সম্পর্কে মহানবি (সা.) বলেন–

اَلْمُؤَذِّنُوْنَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থ: 'কিয়ামতের দিন মুয়াযযিনের ঘাড় সবার চাইতে উঁচু হবে।' (মুসলিম) অর্থাৎ তাদেরকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করা হবে।

আযানের শব্দসমূহ

নামাযের সময় হলে পূতপবিত্র হয়ে কোনো উঁচু স্থানে কিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে (দুই কানের মধ্যে শাহাদাত আঙুলদ্বয় প্রবেশ করিয়ে) উঁচুস্বরে আযানের নিম্নোক্ত বাক্যগুলো থেমে থেমে উচ্চারণ করতে হয় :

ক্রমিক নং	আযানের বাক্যসমূহ	বাক্যসমূহের অর্থ	উচ্চারণ করতে হবে
১	اَللّٰهُ اَكْبَرُ	আল্লাহ মহান	৪ বার
২	اَشْهَدُ أَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই	২ বার
৩	اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসুল	২ বার
৪	حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ	এসো সালাতের দিকে	২ বার
৫	حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ	এসো সফলতার দিকে	২ বার
৬	اَللّٰهُ اَكْبَرُ	আল্লাহ মহান	২ বার
৭	لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ	আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই	১ বার

ফজরের আযানে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ এর পর اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ (ঘুমের চেয়ে নামায উত্তম) বাক্যটি দুইবার বলতে হয়। حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ উচ্চারণের সময় ডান দিকে এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ উচ্চারণের সময় বাম দিকে মুখ ফিরাতে হয়, তবে বুক কিবলামুখী থাকবে।

আযানের জবাব :

আযান শ্রবণকারীর উপর মৌখিক জবাব দেওয়া সুন্নত । মুয়াযযিন যা বলবেন, শ্রোতা তা উচ্চারণ করে জবাব দিবেন। প্রতিধ্বনি করবেন। যেমন মুয়াযযিন اَللّٰهُ أَكْبَرُ বলা শেষ করলে শ্রোতা অনুচ্চ আওয়াযে আল্লাহু আকবার বলবেন। আবার أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّٰهِ বললে- শ্রোতা তা বলবেন এবং সাথে 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' যোগ করবেন। কারণ, মহানবি (সা.) এর নাম উচ্চারিত হলে দরুদ পড়তে হয়। মুয়াযযিন حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ও حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ বললে শ্রোতা বলবেন لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ । অন্য বাক্যগুলো মুয়াজ্জিনের ন্যায় বলবেন। আযানের জবাব দেওয়া প্রসঙ্গে হাদিসে এসেছে, 'যে ব্যক্তি আযানের জবাবে অনুরূপ বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' (মুসলিম)

আযানের দোয়া:

আযান শেষ হলে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতে হয়:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ، اٰتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَا الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ-

অর্থ: 'হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান এবং এই শাশ্বত নামাযের তুমিই প্রভু। হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে দান করো সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান, সুমহান মর্যাদা এবং বেহেশতের শ্রেষ্ঠতম প্রশংসিত স্থানে তাঁকে অধিষ্ঠিত করো, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছ। কেয়ামত দিন আমাদেরকে তাঁর শাফাআত নসিব করো। নিশ্চয় তুমি ভঙ্গ কর না অঙ্গীকার।'

ইকামত

ইকামত অর্থ দাঁড় করানো, প্রতিষ্ঠা করা। নামাযের জামাআত আরম্ভ হওয়ার পূর্বে আযানের বাক্য দ্বারা নামায আরম্ভ হওয়ার কথা ঘোষণা করাকে ইকামত বলে। ইকামতের মাধ্যমে মুসল্লিদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, জামাআত শুরু হচ্ছে, সবাই দাঁড়িয়ে যান, কাতার সোজা করুন। ইকামত আযানের মতোই। তবে ইকামতে দুইবার حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার পর قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ (নামায দাঁড়িয়ে গেছে) দুই বার বলতে হয়। ইকামত শেষে নিয়ত করে দুহাত কান বরাবর উঠিয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে নাভির নিচ বরাবর হাত বেঁধে সালাত শুরু করতে হয়।

বিভিন্ন প্রকার সালাত

সালাতুল বিতর

'বিতর' আরবি শব্দ। এর অর্থ বেজোড়। এ সালাত তিন রাকআত বিধায় এটিকে বিতর বলা হয়। এশার সালাতের পর তিন রাকাআত বিতর সালাত আদায় করা ওয়াজিব।

বিতর সালাত পড়ার নিয়ম

অন্যান্য ফরয সালাতের ন্যায় দুই রাকআত সালাত পড়ে তাশাহহুদ পড়তে হয়। এরপর তৃতীয় রাকআতেরে জন্য দাড়িয়ে সূরা ফাতিহার পর কোনো সূরা বা আয়াত পড়তে হয়। কিরাআত শেষ করার পর 'আল্লাহু আকবার' বলে দু'হাত কান পর্যন্ত উঠাতে হয়। তারপর হাত বেঁধে চুপে চুপে দোয়া কুনুত পড়তে হয়। দোয়া কুনুত শেষে রুকুতে যেতে হয়। তারপর যথারীতি দুই সিজদার পর শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ, দরুদ ও দোয়া মাসুরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে বিতর সালাত সমাপ্ত করতে হয়।

দোয়া কুনুত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ
وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ
وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ .

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমরা আপনার সাহায্য চাই, আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, আপনার উপর আমরা ইমান এনেছি এবং , আপনার উপরই ভরসা করি, আর আপনার উত্তম প্রশংসা করি এবং আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, আপনার প্রতি অকৃতজ্ঞ হই না, যারা আপনার নাফরমানি করে, আমরা তাদের ত্যাগ করি এবং তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি। হে আল্লাহ! আমরা আপনারই ইবাদাত করি, আপনার উদ্দেশ্যেই সালাত পড়ি এবং আপনাকেই সিজদাহ করি। আপনার দিকেই ধাবিত হই এবং আপনার হুকুম পালনের জন্যই সদা সচেষ্ট থাকি। আমরা আপনার রহমতের আশা করি, আর আপনার শাস্তিকে ভয় পাই। নিঃসন্দেহে আপনার আযাব তো কাফেরদের সাথে সম্পৃক্ত।

জুমার সালাত

উম্মতে মুহাম্মাদির শ্রেষ্ঠ দিন হলো জুমার দিন। আর এই দিনের শ্রেষ্ঠ ইবাদাত হলো জুমার সালাত। জুমা শব্দের শাব্দিক অর্থ একত্রিত হওয়া, কাতারবদ্ধ হওয়া, সমবেত হওয়া ইত্যাদি। শুক্রবারে সকল মুসলমান একত্রিত হয়ে যুহরের সালাতের পরিবর্তে জামাআত সহকারে যে সালাত আদায় করে তা হলো জুমার সালাত।

জুমার সালাতের গুরুত্ব

জুমার সালাত আদায় করা ফরয। কেউ যদি এই সালাতকে অস্বীকার করে তাহলে সে কাফির বলে পরিগণিত হবে। বিনা ওযরে কেউ যদি পর তিন জুমআহ বাদ দেয় তাহলে সে আল্লাহর কাছে মুনাফিক হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়। এই সালাতের অনেক ফযিলত রয়েছে। সালাতের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا
اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

অর্থ: 'হে মুমিনগণ! জুমার দিনে যখন সালাতের জন্য আহবান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ করো, এটি তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা উপলব্ধি করো।' (সুরা জুমু'আ, আয়াত-৯)

জুমার দিনের তাৎপর্য প্রসঙ্গে মহানবি (সা.) বলেন, 'সপ্তাহের দিনগুলোর মধ্যে জুমার দিনই সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। এই দিনেই আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং এই দিনেই তাঁকে জান্নাতে স্থান দেওয়া হয়েছিল। এই দিনেই তাঁকে জান্নাত থেকে বের করে দুনিয়ায় পাঠানো হয় এবং এই দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে।' (বুখারি) জুমার দিনে দোয়া কবুলের সম্ভাবনা বেশি। হযরত ফাতিমা (রা.) শুক্রবার দিনের শেষ ভাগে আসরের পর কাজকর্ম ছেড়ে আল্লাহর যিকর ও দোয়ায় শামিল হতেন। এদিনে আসর হতে মাগরিব পর্যন্ত সময়ে দোয়া কবুল হওয়ার অধিক সম্ভবনা রয়েছে।

জুমার সালাত আদায়ের নিয়ম

ইসলামে জুমার সালাত আদায়ের প্রতি খুবই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যেমন – মহানবি (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে পর পর তিন জুমার সালাত পরিত্যাগ করে, তার অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয় এবং তার অন্তরকে মুনাফিকের অন্তরে পরিণত করে দেওয়া হয় (তিরমিযি)।
জুমার দিনে প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকাআত তাহিয়্যাতুল অযু ও দুই রাকাআত দুখুলুল মসজিদ নফল সালাত আদায় করে চার রাকাআত কাবলাল জুমা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আদায় করতে হয়। এর পর ইমাম সাহেব মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে সময় উপযোগী খুতবা (ভাষণ) প্রদান করেন। মুসল্লিদের জন্য এই খুতবা শোনা ওয়াজিব। এই সময় কথা বলা নিষেধ। খুতবা শেষে ইমামের পিছনে দুই রাকাআত ফরয সালাত আদায় করতে হয়। কোনো কারণে জুমার সালাতে শরিক হতে না পারলে যুহরের সালাত আদায় করতে হয়।

জুমার দিনের আদব

১. জুমার দিনে ইবাদাতের নিয়তে গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করা।
২. মসজিদে যাওয়ার পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করা।
৩. নখ কাটা।
৪. সুরা কাহাফ তিলাওয়াত করা।
৫. জুমা দিবসে বেশি করে দরুদ পড়া।

সালাতুল জানাযা

জানাযা শব্দটি আরবি। এর শাব্দিক অর্থ হলো খাট বা খাটিয়া, খাটিয়ার উপর দাফন কাফনের জন্য রক্ষিত লাশ। আর সালাতুল জানাযা হলো এক বিশেষ সালাত যা মৃত মুসলমানকে কবর দেওয়ার আগে অনুষ্ঠিত হয়। শরিয়তের দৃষ্টিতে জানাযার সালাত হলো 'ফরযে কেফায়া'। সমাজের কিছুসংখ্যক লোক আদায় করলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়। কিন্তু কেউ আদায় না করলে সবাই গুনাহগার হবে। এই সালাতের মধ্যে রুকু ও সেজদা করার বিধান নেই। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া জানাযার সালাত বসে আদায় করার সুযোগ নেই।

জানাযা সালাতের ফরয ২টি

১. তাকবির তথা اَللّٰهُ أَكْبَرُ (আল্লাহু আকবর) চারবার সরবে উচ্চারণ করা।
২. দণ্ডায়মান হয়ে সালাত আদায় করা।

জানাযা সালাতের ওয়াজিব ১টি

১. তাকবিরের পর ডানে ও বামে দুবার সালাম বলে সালাত শেষ করা।

জানাযা সালাতে সুন্নত ৩টি

১. হামদ ও সানা পড়া।
২. দরুদ শরিফ পড়া।
৩. মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা।

জানাযা সালাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

জানাযা সালাত মূলত মৃত ব্যক্তির প্রতি জীবিতদের পক্ষ থেকে বিশেষ দোয়া ইসলামি শরিয়তে জানাযা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। জানাযা সালাতে মৃত-জীবিত, উপস্থিত, অনুপস্থিত নারী-পুরুষ সবাইকে দোয়ার মধ্যে শামিল করা হয়। এ প্রসঙ্গে মহানবি (সা.) বলেছেন, 'যখন তোমরা মৃত ব্যক্তির জানাযার সালাত আদায় করবে, তখন তার জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করবে।' (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ) জানাযা সালাতে শুধু মৃত ব্যক্তি উপকৃত হয় না বরং জানাযায় অংশগ্রহণকারী সকলে উপকৃত হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি জানাযার সালাত আদায় করবে তার জন্য এক কিরাত (অসীম সওয়াব) আর যে ব্যক্তি দাফন কার্য সম্পাদন হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করবে তার জন্য দুই কিরাত (অসীম সওয়াব) রয়েছে।' (তিরমিযি) উল্লেখ্য, একেকটি কিরাত হলো উহুদ পাহাড় পরিমাণ। সুতরাং আমরা জানাযা সালাত আদায় করে অসীম সওয়াব লাভের চেষ্টা করব।

সালাতুল জানাযা আদায়ের নিয়ম

মৃত ব্যক্তিকে কিবলার দিকে মুখ রেখে ইমাম বুক বরাবর দাঁড়াবে। তারপর মনে মনে নিয়ত করতে হবে। প্রথম তাকবির বলে দুই হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে হাত বাঁধবে। অতঃপর সানা পড়বে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন 'ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা' এর পর 'ওয়া জাল্লা সানা উকা' বাক্যটি পড়া হয়। সানা শেষ হলে হাত বাঁধা অবস্থায় দ্বিতীয় তাকবির বলে দরুদ শরিফ পড়বে।

এরপর আবার তৃতীয় তাকবির বলে নিম্নের দোয়াটি পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا

اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাগফির লিহাইয়্যিনা ওয়া মায়্যিতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা ওয়া ছাগিরিনা ওয়া কাবিরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসানা। আল্লাহুম্মা মান আহয়িয়াইতাহু মিন্না ফাআহয়িহি আলাল ইসলামি ওয়ামান তাওয়াফ্ ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্ ফাহু আলাল ইমান।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত, আমাদের মৃত, আমাদের মধ্যে উপস্থিত ও অনুপস্থিত, আমাদের মধ্যে ছোট ও বড়, আমাদের মধ্যে নারী ও পুরুষ সকলকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের মধ্যে যাদেরকে বাঁচিয়ে রাখবেন তাদেরকে ইসলামের উপর বাঁচিয়ে রাখুন এবং আপনি যাদেরকে মৃত্যু দেবেন, তাদেরকে ইমানের ওপর মৃত্যু দান করুন।

সালাতুল ঈদাইন

ঈদ আরবি শব্দ। এর অর্থ আনন্দ, খুশি, উৎসব ইত্যাদি। ঈদের দিন হলো মুসলমানদের জন্য এক আনন্দ ও উৎসবের দিন। এ প্রসঙ্গে মহানবি (সা.) বলেছেন, 'প্রত্যেক জাতিরই উৎসবের দিন আছে। আর আমাদের উৎসব হলো ঈদ।' (বুখারি ও মুসলিম)

বছরে দুটি ঈদ। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। ঈদের দিন এলাকার মুসল্লিগণ একত্রে ঈদগাহে সমবেত হন এবং দুই রাকআত ঈদের সালাত আদায় করে। ঈদের দিন বিশ্বের সকল মুসলিম পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঈদগাহে গিয়ে ছোট-বড়, আমির-ফকির একই কাতারে দাঁড়িয়ে এই বিশেষ ইবাদাত পালন করে থাকেন।

ঈদের সালাত আদায়ের নিয়ম

ঈদের দিন সূর্যোদয়ের পর থেকে দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত ঈদের সালাত আদায় করা যায়। প্রথমে কাতার করে নিয়ত করবে। তাকবিরে তাহরিমা বলে হাত বাঁধবে। সানা পড়বে। তারপর ইমাম সাহেবের সাথে অতিরিক্ত তিনটি তাকবির বলবে। প্রত্যেক তাকবিরে কান পর্যন্ত হাত উঠবে। প্রথম দুই তাকবিরে হাত বাঁধবে না। তৃতীয় তাকবিরে অন্যান্য সালাতের মতো হাত বাঁধবে। ইমাম সাহেব স্বাভাবিক নিয়মে প্রথম রাকআত শেষ করে দ্বিতীয় রাকআতের রুকুতে যাওয়ার পূর্বে অতিরিক্ত তিনটি তাকবির বলবেন। মুসল্লিরাও তার সাথে তাকবির বলবে। তাকবিরে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে ছেড়ে দেবেন, হাত বাঁধবে না। চতুর্থ তাকবিরে রুকুতে যাবে। এরপর স্বাভাবিক নিয়মে সালাত শেষ করবে। সালাত শেষে ইমাম সাহেব দুটি খুতবা দেবেন। প্রত্যেক মুসল্লি খুতবা শোনা ওয়াজিব। ঈদের মাঠে যাবার পথে ঈদুল আযহার তাকবির ঈদুল ফিতরের তাকবিরের অনুরূপ। আর ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের সালাত আদায়ের পদ্ধতি একই, শুধু নিয়তের বেলায় আলাদা নিয়ত করতে হবে।

ঈদের সালাতের সামাজিক প্রভাব

ঈদ মানে মহা আনন্দের আয়োজন। ঈদ আমাদের সমাজ সংস্কৃতির সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। ঈদ ধর্মীয় উৎসব হলেও এটি এখন সামাজিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। ঈদের দিন পরিবারের যে যেখানেই থাকুক না কেন, সবাই একত্র হয়ে থাকে। সকল আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার এটাই সর্বোত্তম সুযোগ হয়ে থাকে। ঈদের দিন মুসলমানরা একে অপরের খোঁজখবর নেয় ও একে অপরের সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে থাকে। ধনী-গরিব সবাই সকল প্রকার দুঃখ ভুলে আনন্দে থাকার চেষ্টা করে। সকল ভেদাভেদকে ভুলে সবাই একত্র হয়। ঈদের দিন পুরুষরা দলে দলে ঈদগাহে যায়। ছোট ছোট শিশুরা বাবা, ভাই ও পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে নতুন জামাকাপড় পড়ে ঈদগাহে যায়। সবার মধ্যে এক আনন্দঘন পরিবেশ তৈরি হয়। জামাআতবদ্ধ হয়ে সবাই নামাজ আদায় করে। নামাজ শেষে একে অপরের সাথে কোলাকুলি করে। ঈদগাহে প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ও এলাকার সকলের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার সুযোগ পায় সবাই। এর মধ্যে দিয়ে সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি হয়। গরিব ও অসহায়েরা বিভিন্ন সমস্যার কথা উপস্থিত মুসল্লিদের বলার সুযোগ পায় ও প্রয়োজনীয় সাহায্য পেয়ে থাকে। ঈদের দিন সবাই আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীদের বাড়িতে যায়। কুশল বিনিময় করে থাকে। এর মধ্যে দিয়ে আত্মীয়ের বন্ধন দৃঢ় হয়। ঈদের দিন আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের বাসায় একে অপরে খাওয়া-দাওয়া করে থাকে। যার মধ্যে দিয়ে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় ও মজবুত হয়।

সালাতুত তারাবিহ

তারাবিহ আরবি শব্দ। এর অর্থ বিশ্রাম করা, আরাম করা। শরিয়তের পরিভাষায় মাহে রমযান মাসে এশার সালাতের পর অতিরিক্ত ২০ রাকআত সুন্নত সালাতকে 'সালাতুত তারাবিহ' বলা হয়। এ সালাতকে তারাবিহ নাম রাখা হয়েছে এ কারণে যে, এতে প্রতি চার রাকআত অন্তর কিছুক্ষণ বসে বিশ্রাম নেওয়া হয়। এ সালাত সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। নবি করিম (সা.) নিজে এ সালাত আদায় করেছেন ও সাহাবিগণকে আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। তারাবি-এর সালাত জামাআতে আদায় করা সুন্নত।

তারাবিহর সালাত আদায়ের নিয়ম

রমযান মাসে এশার চার রাকআত ফরয ও দুই রাকআত সুন্নতের পর বিতর নামাযের পূর্বে তারাবিহের নিয়তে দুই রাকআত দুই রাকাআত করে মোট বিশ রাকআত সালাত আদায় করতে হয়। প্রতি চার রাকআত পর পর বিশ্রাম নিতে হয়। তখন বিভিন্ন তাসবিহ পড়া যায়। এসময় নিম্নের দোয়াটিও পড়া যায়:

سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ

উচ্চারণ: সুবহানাযিল মুলকি ওয়াল মালাকুতি সুবহানাযিল ইযযাতি ওয়াল আযমাতি ওয়াল হাইবাতি ওয়াল কুদরাতি ওয়াল কিবরিয়াই ওয়াল জাবারুত। সুবহানাল মালিকিল হাইয়্যিল্লাযি লা-ইয়ানামু ওয়ালাইয়ামুতু আবাদান আবাদা। সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুনা ওয়ারাব্বুল মালাইকাতি ওয়ার রূহ।

তারাবিহের সালাত শেষ করে বিতরের সালাত রমযান মাসে জামাআতে আদায় করার বিধান রয়েছে।

তারাবিহ সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত

মাহে রমযানে তারাবিহ নামায আদায় করা অত্যন্ত সাওয়াবের কাজ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: মহান আল্লাহ তা'আলা মাহে রমযানের রোযা ফরয করেছেন এবং রাতে তারাবিহ নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হওয়াকে পুণ্যের কাজ হিসেবে অভিহিত করেছেন।

পবিত্র রমযান মাস রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের মাস। পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার শ্রেষ্ঠ সময় হলো রমযান মাস। সারা দিন সাওম (রোযা) পালনের পর বান্দা যখন ক্লান্ত শরীরে তারাবিহের বিশ রাকআত সালাত আদায় করে তখন আল্লাহ সে বান্দার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হন। বান্দার জন্য এমন সুযোগ বছরে মাত্র একমাসেই আসে। তাই আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে আল্লাহর রহমত পেতে ব্রতী হন। এ প্রসঙ্গে নবি করিম (সা.) বলেন,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

অর্থ: 'যে ব্যক্তি ইমানের সাথে আখিরাতে প্রতিদানের আশায় রমযানের তারাবিহের সালাত আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা তার সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন।' (বুখারি)

তারাবিহের সালাত ছোট ছোট সুরার মাধ্যমেও আদায় করা যায়। [আবার কুরআন খতমের মাধ্যমেও আদায় করা যায়। তারাবিহ-এর বিশ রাকাআতে পবিত্র কুরআন ধারাবাহিকভাবে তিলাওয়াত করে পূর্ণ কুরআন সমাপ্ত করাই নিয়ম। তবে মনে রাখতে হবে যে, সূরাগুলো স্পষ্ট, ধীরস্থির ও ছন্দের সাথে পড়তে হবে। রমযান মাসে তারাবিহের সালাত একত্রিত হয়ে জামাআতে আদায় করা উত্তম। এতে নামাযে ভুল হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। দীর্ঘ একটি মাস পরস্পরের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ও মতবিনিময়ের ফলে পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা, মমত্ববোধ, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে, হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভূত হয়। অতএব, ফজিলতপূর্ণ এ নামায রমযানের পুণ্যময় সময়ে জামাআতের সাথে আদায় করা প্রত্যেক ইমানদার মুসলমানের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর।

দলগত কাজ: তারাবিহ নামায জামাআতে আদায় করলে ভুল কম হয়-এ নিয়ে শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করবে।

মাসবুকের সালাত

যে মুক্তাদি ইমামের সাথে সালাতের প্রথম রাকআত থেকে পায় নি, তাকে মাসবুক (পিছে পড়া) বলে। মাসবুক ব্যক্তি জামাআতে সালাত আদায় করতে গিয়ে ইমামকে যে অবস্থায় পাবে, সে অবস্থাতেই নিয়ত করে নামাযে অংশগ্রণ করবে। তারপর ইমামের সাথে সে নামায পড়তে থাকবে এবং যথারীতি রুকু সিজদাহ করে তাশাহহুদ পাঠের জন্য শেষ বৈঠকে বসে যাবে এবং 'আব্দুহু ওয়া রাসুলুহু' পর্যন্ত পড়ে অপেক্ষা করবে। ইমাম সালাম ফিরালে মাসবুক ব্যক্তি সালাম না ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে এবং ছুটে যাওয়া রাকআতগুলো যথারীতি আদায় করবে। অবশিষ্ট সালাতে তার নিজের ভুল হলে সাহু সিজদাহও করতে হবে।
প্রথমে কিরাআতওয়ালা রাকআত অর্থাৎ সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য সূরা মিলানো রাকআত এবং পরে কিরাআতবিহীন শুধু সূরা ফাতিহাওয়ালা রাকআত পড়বে। তারপর শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ, দরূদ, দোয়া মাসুরা পড়ে সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করবে।
রুকুসহ ইমামের সথে যে কয় রাকআত পাওয়া যায় তা আদায় হয়ে যায়। রুকুর পর ইমামের পেছনে ইক্তেদা বা নামাযে দাঁড়ালে ঐ রাকআত মাসবুককে আদায় করতে হবে।
মুক্তাদির সালাত এক, দুই, তিন, চার রাকআত ছুটে গেলে, তা আদায়ে কিছুটা তারতম্য রয়েছে।

মুক্তাদি ইমামের পেছনে ইক্তেদা করার পর যদি এক রাকআত ছুটে যায়, তবে ইমামের সালাম ফেরানোর পর দাঁড়িয়ে যাবে এবং ছুটে যাওয়া এক রাকআত সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য সূরা মিলিয়ে আদায় করে নেবে।

দুই রাকআত ছুটে গেলে ইমামের সালাম ফেরানোর পর মুক্তাদি দাঁড়িয়ে যাবে এবং ছুটে যাওয়া দুই রাকআত যথানিয়মে আদায় করবে, যেভাবে ফজরের দুই রাকআত ফরয সালাত একাকী আদায় করা হয়।

তিন রাকআত ছুটে গেলে ইমামের সালাম ফেরানোর পর মুক্তাদি দাঁড়িয়ে যাবে। এক রাকআত সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য সূরা মিলিয়ে আদায় করে প্রথম বৈঠক করবে। এ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার পর আবার দাঁড়িয়ে যাবে এবং বাকি দুই রাকআতের প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য সূরা মিলিয়ে আদায় করবে এবং পরের রাকআতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে । এরপর শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ, দরূদ, দোয়া মাছুরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করবে।

চার রাকআত ছুটে গেলে অর্থাৎ মুক্তাদি ইমামকে শেষ বৈঠকে পেলে ইমামের সালাম ফেরানোর পর মুক্তাদি দাঁড়িয়ে যাবে। এরপর সে একাকী চার রাকআত নামায পড়লে যেভাবে পড়ত, ঠিক সেভাবে চার রাকআত নামায আদায় করবে।

চার, তিন, দুই রাকআত বিশিষ্ট নামাযে মুক্তাদি ইমামকে শেষ বৈঠকে পেলে ইমামের সালাম ফেরানোর পর মুক্তাদি দাঁড়িয়ে যাবে। যথানিয়মে ছুটে যাওয়া রাকআতগুলো এমনভাবে আদায় করে নেবে, যেভাবে একজন মুসল্লি একাকী চার, তিন, দুই রাকআত বিশিষ্ট সালাত আদায় করে থাকে।

দলগত কাজ: কোনো একজন শিক্ষার্থী জোহরের নামায আদায় করতে মসজিদে গিয়ে ইমামের সাথে এক রাকআত পেয়েছে। অবশিষ্ট নামায কীভাবে আদায় করবে? শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করবে।

রুগ্ণ ব্যক্তির সালাত

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ফরয। নির্ধারিত ওযর ব্যতীত সালাত পরিত্যাগ করা যাবে না। রুগ্ণ ব্যক্তি যথানিয়মে সালাত আদায় করতে না পারলে, তার জন্য ইসলামে সহজ নিয়মের অনুমোদন রয়েছে। রোগীর সেই সহজ নিয়মে সালাত আদায়কে রুগ্ণ ব্যক্তির সালাত বলে।

রুগ্ণ ব্যক্তির সালাত আদায়ের নিয়ম

রুগ্ণ ব্যক্তির জন্য জ্ঞান থাকা পর্যন্ত সালাত আদায় করা বাধ্যতামূলক। রোগ যত কঠিন হোক না কেন, সম্পূর্ণরূপে অপারগ না হলে সালাত ত্যাগ করা যাবে না। যথাসম্ভব ওয়াক্তের মধ্যেই নামায আদায় করতে হবে। নামাযের সমুদয় আরকান-আহকাম যথাযথভাবে আদায় করতে সামর্থ্য না হলে ইশারায় হলেও ওয়াক্তের মধ্যেই নামায আদায় করতে হবে।

রোগীর দাঁড়াতে কষ্ট হলে বসে রুকু-সিজদাহর সাথে সালাত আদায় করবে। রুকু-সিজদাহ করতে অক্ষম হলে বসে ইশারায় সালাত আদায় করবে। রুগ্ণ ব্যক্তিকে বসার সময় সালাতের অবস্থায় বসতে হবে। যদি রোগী এতই দুর্বল হয় যে বসে থাকা সম্ভব নয়, তবে কিবলার দিকে পা দুটি রাখতে হবে। পা সোজা না রেখে হাঁটু উঁচু করে রাখতে হবে এবং মাথার নিচের বালিশ বা এ-জাতীয় কিছু জিনিস রেখে মাথা একটু উঁচু রাখতে হবে। শুয়ে ইশারায় রুকু ও সিজদাহ করবে অথবা উত্তর দিকে মাথা রেখে কাত হয়ে শুয়ে এবং কিবলার দিকে মুখ রেখে ইশারায় সালাত আদায় করবে। যদি এভাবেও সালাত আদায় করা সম্ভব না হয়, তবে যেভাবে সম্ভব সেভাবে সালাত আদায় করতে হবে।

অপারগ অবস্থায় বা কেউ বেহুঁশ হয়ে পড়লে যদি চব্বিশ ঘণ্টা সময় অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বা তার চেয়ে কম সময় অতিক্রান্ত হয়, তাহলে সক্ষম হওয়ার পর রুগ্ণ ব্যক্তিকে ধারাবাহিকভাবে কাযা করতে হবে। যদি পাঁচ/ ছয় ওয়াক্তের বেশি সময় অতিবাহিত হয়, তবে আর ধারাবাহিকভাবে কাযা করতে হবে না। এ নামায আদায় না করতে পারার জন্য মহান আল্লাহর নিকট তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

নামাযরত অবস্থায় কেউ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে, দাঁড়িয়ে নামায পড়তে না পারলে বসে পড়তে হবে, বসে না পারলে শুয়ে বা ইশারা করে বাকি নামায আদায় করতে হবে।

দলগত কাজ: রুগ্ণ ব্যক্তির নামায আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে আলোচনা করবে।

মুসাফিরের সালাত

'মুসাফির' আরবি শব্দ। এর অর্থ সফরকারী। কোনো ব্যক্তি তার অবস্থানস্থল থেকে ৪৮ মাইল তথা ৭৮ কিলোমিটার দূরে সফর করার নিয়তে বের হয়ে নিজ শহর বা গ্রাম পেরিয়ে গেলেই তিনি মুসাফির হয়ে যান। আর এ অবস্থায় গন্তব্যস্থলে কমপক্ষে ১৫ দিন অবস্থান করার নিয়ত না করা পর্যন্ত মুসাফির হিসেবে গণ্য হবেন। মানুষের জীবনে সফর কিংবা ভ্রমণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানুষ যখন নিজের আবাসস্থলে থাকে, তখন পূর্ণাঙ্গ সালাত আদায় করতে হয়। কিন্তু ভ্রমণে বা সফরে মুসাফির অবস্থায় যোহর, আসর ও এশার ফরজ সালাত কসর করতে হয়। 'কসর'-এর অর্থ হলো কম করা বা সংক্ষেপ করা। কসর আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য এক ধরনের সুবিধা। শরিয়াত নির্ধারিত দূরত্বে সফর করা কালে সালাত সংক্ষেপ করা ইসলামের বিধান। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'তোমরা যখন জমিনে সফর করবে, তখন তোমাদের জন্য সালাতের কসর করায় কোনো দোষ নেই।' (সুরা নিসা, আয়াত: ১০১)

মুসাফিরের সালাত আদায়ের পদ্ধতি

মুসাফির ব্যক্তি চার রাকাআত বিশিষ্ট যোহর, আসর ও এশার ফরয সালাত দুই রাকাআত পড়বেন। কসর শুধু চার রাকাআত বিশিষ্ট ফরয সালাতেই হয়ে থাকে। অতএব, মাগরিব, ফজর এবং সুন্নত ও বিতরের সালাতে কোনো কসর নেই। আর এইভাবে সংক্ষেপে সালাত আদায়ের মধ্যেই আল্লাহ তা'আলা কল্যাণ রেখেছেন। মুসাফির চার রাকাআত বিশিষ্ট ফরয সালাত একাকী পড়লে বা মুসাফির ইমামের পেছনে আদায় করলে, কসর করবে। এ ক্ষেত্রে পূর্ণ নামাজ পড়া ঠিক নয়। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নবির মুখে সালাতকে মুকিম অবস্থায় চার রাকাআত ও সফর অবস্থায় দুই রাকাআত ফরয করেছেন।' (মুসলিম) মুসাফির ব্যক্তি সফর অবস্থায় ইচ্ছাকৃত চার রাকাআত সালাত পূর্ণ করবে না। কিন্তু মুকিম ইমামের পেছনে ইকতিদা করলে ইমামের অনুসরণ করে পূর্ণ সালাত আদায় করবে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'মুসাফির যদি মুকিমদের সঙ্গে সালাতে শরিক হয়, তবে সে যেন তাদের মতো চার রাকাআত সালাত পড়ে।' (ইবনে আবি শাইবা) মুসাফির ইমামতি করলে মুক্তাদিদের আগেই বলে দেবে যে সে মুসাফির এবং দুই রাকাআত পড়ে সালাম ফিরাবে আর মুকিম মুক্তাদিগণ দাঁড়িয়ে বাকি দুই রাকাআত সালাত আদায় করে নেবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) সফর অবস্থায় সর্বদা সালাত কসর করেছেন। মুসাফির ব্যক্তির জন্য চলন্ত অবস্থায় সুন্নত না পড়ার সুযোগ রয়েছে। তবে স্বাভাবিক ও স্থির অবস্থায় সুন্নত সালাত আদায় করবে।

সালাতের নিষিদ্ধ সময়

ইসলাম সময় ব্যবস্থাপনার ওপর অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করে। ইসলামে অনেক ইবাদাত ও আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে যা সরাসরি সময়ের সাথে সম্পর্কিত এবং সেগুলো নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই পালন করতে হয়। ইসলামের অন্যতম মৌলিক ভিত্তি এবং অপরিহার্য ইবাদাত-সালাত আদায়ের জন্যও সুনির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে। মহানবি (সা.) এর হাদিসে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত আদায়ের উত্তম সময় সম্পর্কে যেমন নির্দেশনা রয়েছে তেমনি সালাতের নিষিদ্ধ সময় সম্পর্কেও নির্দেশনা রয়েছে। সালাতের নিষিদ্ধ সময় তিনটি। আর তা হলো–

১. ঠিক সূর্যোদয়ের সময়;

২. ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়; এবং

৩. সূর্যাস্তের সময়।

এ সময়গুলোতে সাধারণত সালাত আদায় করা নিষেধ। তবে কোনো কারণে কেউ যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঐ দিনের আসরের সালাত আদায় করতে না পারে তবে তা আদায় করা যাবে কিন্তু মাকরূহ হবে। এ নিষিদ্ধ সময় প্রসঙ্গে সাহাবি উকবা ইবনে আমের জুহানী (রা.) বলেন, 'তিনটি সময়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে সালাত আদায় করতে এবং মৃতদের দাফন করতে নিষেধ করতেন। সূর্য উদয়ের সময়;যতক্ষণ না তা পুরোপুরি উঁচু হয়ে যায়। সূর্য মধ্যাকাশে অবস্থানের সময় থেকে শুরু করে তা পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া পর্যন্ত। এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে তা হলুদাভ হওয়া থেকে শুরু করে যতক্ষণ না তা পুরোপুরি অস্ত যায়।' (মুসলিম)

সাহু সিজদাহ

সাহু শব্দের অর্থ হলো ভুলে যাওয়া। সাহু সিজদাহ অর্থ ভুল সংশোধনমূলক সিজদাহ। সালাতের কার্যক্রমে ভুলক্রমে কোন ওয়াজিব বাদ পড়লে যেমন রাকাআত সংখ্যা ভুলে কম-বেশি হয়ে গেলে তা সংশোধনের জন্য সালাতের শেষ বৈঠকে দুটি সিজদাহ দেওয়া ওয়াজিব। শরিয়তের দৃষ্টিতে এই রকম সিজদাই হলো সাজদাতুস সাহবু বা সাহু সিজদাহ। রাসুল (সা.) সালাতের ভুল সংশোধনের জন্য এই রকম আমল করেছেন যা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

সাহু সিজদাহ ওয়াজিব হওয়ার কারণ

১. সালাতের কোনো ওয়াজিব ভুলক্রমে ছুটে গেলে।

২. কোনো ওয়াজিব পুনরায় বা দুইবার আদায় করা হলে।

৩. সালাতের কোনো ওয়াজিব যথাযথভাবে আদায় না করা যেমন রুকু থেকে সাজদাহ বিলম্বে আদায় করলে।

৪. ভুলক্রমে কোন ফরয দুইবার আদায় করা হলে।

৫. কোনো ওয়াজিব পরিবর্তন হলে। যেমন যে সালাতে ক্বিরাত প্রকাশ্যে পড়ার বিধান পড়া হয় সেই সালাতে গোপনে ক্বিরাত পড়া। অপরপক্ষে যে সালাতে ক্বিরাত গোপনে পড়া হয়, সেই সালাতে প্রকাশ্যে ক্বিরাত পড়া।

৬. সালাতের ফরযসমূহ আদায় করতে গিয়ে ধারাবাহিকতা রক্ষা না করা। যেমন কোনো ফরযকে এগিয়ে আনা আবার কোন ফরযকে পিছিয়ে দেওয়া।

সাহু সিজদাহ আদায়ের নিয়ম

সালাতের শেষ বৈঠকে তাশাহুদ তথা আত্তাহিয়্যাতু শুরু করে 'আবদুহু ওয়ারাসুলুহু' পর্যন্ত পড়ে ডান দিকে সালাম ফিরাতে হয়। অতঃপর 'আল্লাহু আকবর' বলে দু'টি সিজদাহ আদায় করতে হয়। উল্লেখ্য, সিজদাহ দুটিতে নিয়ম অনুযায়ী তাসবিহ পড়তে হয়। এরপর বসে যথানিয়মে তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু), দরূদ শরিফ ও দোয়া মাসূরা পড়ে দুই দিকে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করতে হয়।

সালাত সংশ্লিষ্ট তাসবিহ ও দোয়াসমূহ

সালাতের প্রয়োজনীয় দোয়াসমূহ

সালাত আদায়ের সময় অনেকগুলো দোয়া এবং তাসবিহ পড়তে হয়। তার মধ্য থেকে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো। আমরা এইগুলো শিখব এবং সালাতে নির্দিষ্ট জায়গায় তা পাঠ করব।

১. **নামাযের পূর্বপ্রস্তুতির দোয়া:** ওযু করে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করার সময় আল্লাহ তা'আলাকে উপস্থিত জেনে পড়তে হবে –

إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

অর্থ: 'আমি পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে আমার মুখমণ্ডল সেই সত্তার দিকে ফিরিয়ে নিয়েছি বা নিবদ্ধ করলাম, যিনি আসমান ও যমিন সৃষ্টি করেছেন, আর আমি তাদের মধ্যে নেই যারা তাঁর সঙ্গে অন্যকে শরিক করে।' (সূরা আল-আনআম, আয়াত: ৭৯)

২. **সালাতের নিয়ত:** এরপর নিয়ত করতে হবে। 'নিয়্যাত' আরবি শব্দ। এর অর্থ ইচ্ছা করা, সংকল্প করা ইত্যাদি। কোনো কিছু করার জন্য মনে মনে দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকেই নিয়ত বলে। নির্দিষ্ট কোনো বাক্যের মাধ্যমে সালাতের নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা আবশ্যক নয়, মনে মনে নিয়ত করলেই হবে। তবে মনসংযোগের জন্য অনুচ্চ আওয়াজে মুখে আওড়ানো যেতে পারে।

৩. **সানা:** তাকবিরে তাহরিমা 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত বাধার পর এই সানা পড়তে হবে।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ إِلٰهَ غَيْرُكَ

উচ্চারণ: সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুকা।

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং প্রশংসা করছি, আপনার নাম বরকতময়, আপনার মর্যাদা অতি উর্ধ্বে। আপনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই।'

৪. তাকবিরে তাহরিমা

اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ: আল্লাহু আকবার

অর্থ: আল্লাহ সবচেয়ে বড়।

৫. রুকুর তাসবিহ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণ: সুবহানা রাব্বিয়্যাল আযীম

অর্থ: আমি আমার রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

৬. রুকু থেকে উঠার তাসবিহ

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

উচ্চারণ: রাব্বানা লাকাল হামদ

অর্থ: হে আমাদের রব! যাবতীয় প্রশংসা আপনারই জন্য

৭. রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো অবস্থার তাসবিহ

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ

উচ্চারণ: সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ

অর্থ: যে ব্যক্তি আল্লাহর তা'আলার প্রশংসা করেন, আল্লাহ তা'আলা (ঐ ব্যক্তির প্রশংসা) শোনেন।

৮. সিজদাহর তাসবিহ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى

উচ্চারণ: সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা

অর্থ: পবিত্রতা ঘোষণা করছি আমার মহান রবের।

৯. তাশাহহুদ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

উচ্চারণ: আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্‌সলাওয়াতু ওয়াত্‌তাইয়েবাতু, আস্‌সালামু আলাইকা আইয়ুহান্‌নাবিয়্যু ওয়া রহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ, আস্‌সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস্‌ সলেহীন, আশ্‌হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহ।

অর্থ: ‘সমুদয় প্রশংসা, সব ইবাদাত ও সমস্ত পবিত্রতা আল্লাহর জন্য। হে নবি! আপনার উপর সালাম আর আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসুল।’

আদর্শ জীবন গঠনে সালাতের ভূমিকা

ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে সালাত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। ইমানের পরই সালাতের স্থান। মহান আল্লাহ তা‘আলার নিকট বান্দার বিনয় ও অনুগত্য প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হলো সালাত। সালাতের মাধ্যমেই আল্লাহর নিকট বান্দার চরম আনুগত্যের অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়। কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ সর্বপ্রথম বান্দার কাছে সালাতের হিসাব চাইবেন।

সালাত নিত্যপালনীয় একটি ফরয ইবাদাত হলেও আদর্শ জীবন গঠনে এর সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রয়েছে। আদর্শ জীবন বিনির্মাণে অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলি সালাত আদায়ের মাধমে অর্জন করা যায়। পাপাচার, অন্যায় ও অশ্লীলতামুক্ত আদর্শ জীবন গঠনে সালাত সহায়তা করে। সালাত সকল প্রকার পাপাচার ও খারাপ কাজ পরিহার করে সৎ পথে পরিচালিত করে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন—

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ

অর্থ: ‘নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।’ (সূরা আল-‘আনকাবূত,আয়াত: ৪৫)

সালাত আমাদের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দেয়। জামাআতে সালাত আদায়ের সময় সমাজের উচু-নিচু, ধনী-নির্ধন এবং সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষ একত্রে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাশাপাশি দাঁড়াতে হয়। এতে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

সালাত আমাদের সময়ানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধের শিক্ষা দেয়। সালাতে রুকু সিজদাহ যথানিয়মে করতে হয়। এতে নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলার শিক্ষা পাওয়া যায়। আর নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায়ের মাধ্যমে সকল কাজ সঠিক সময়ে করারও শিক্ষা পাওয়া যায়। নিয়মিত সালাত আদায়কারী সাধারণত কর্তব্য পালনে অবহেলা করে না।

অত্যন্ত বিনীত ও নম্রভাবে একাগ্র চিত্তে সালাত আদায় করতে হয়। একাগ্রতাবিহীন সালাত আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। সালাত আদায়ের সময় মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হয় মহান আল্লাহ তাকে দেখছেন। এভাবে সালাত আদায়ের মাধ্যমে অর্জিত বিনয় ও একাগ্রতা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে আদর্শ জীবন গঠন করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আল্লাহর যে সকল বান্দা এভাবে বিনয়-নম্রতা ও বিনম্র- একাগ্রতা নিয়ে সালাত আদায় করে তাদের সফলতা অবশ্যাম্ভাবী। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন–

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۙ

অর্থ: 'অবশ্যই মুমিনগণ সফলকাম হয়েছেন,যারা নিজেদের সালাতে বিনয় ও নম্র।' (সূরা মু'মিনূন, আয়াত: ১-২)

জামাআতে সালাত আদায় করলে মুসলিমগণ দৈনিক পাঁচবার একত্র হওয়ার সুযোগ পান। এ সময় একে অপরের খোঁজ-খবর নিতে পারেন। অসহায় ও দরিদ্রকে সাহায্য-সহযোগিতা করা যায়। এতে সকলের সাথে সম্প্রীতি গড়ে ওঠে। এ রকম আরও অনেক উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জনে সালাত প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা রাখে। তাই বলা যায় আদর্শ জীবন গঠনে সালাতের ভূমিকা অপরিসীম। আমরা নিয়মিত সঠিকভাবে সালাত আদায় করব এবং জীবনকে সুন্দর ও আদর্শময় করে গড়ে তুলব।

তাহলে এতক্ষণ আমরা সালাত সম্পর্কে অনেক কিছু জানলাম, শিখলাম। ষষ্ঠ শ্রেণিতেও আমরা সালাত সম্পর্কে জেনেছি। এখন তাহলে আমরা সালাত সম্পর্কিত আমাদের সকল জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করব। কিভাবে জানো? এবার শিক্ষকের সহায়তায় তোমরা সব বন্ধুরা মিলে একটি ডেমোনস্ট্রেশন বা ডিসপ্লে /মহড়ার আয়োজন করবে। সেখানে শিক্ষকের উপস্থিতিতে কীভাবে সঠিক নিয়মে সালাত আদায় করতে হয় তা তোমরা প্রদর্শন করবে।

সাওম

পরবর্তী পাঠে প্রবেশের পূর্বে শিক্ষক তোমাদেরকে একটি গল্প বলবেন এবং সেই সাথে কিছু প্রশ্ন করবেন। শিক্ষকের বলা গল্পটি মনোযোগ সহকারে শুনে শিক্ষক যে প্রশ্ন করবেন তার উত্তর চিন্তা করে বের করার চেষ্টা করো। সাওম এবং যাকাতের পাঠের পর তোমরা সম্মিলিতভাবে বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ করবে। তাই এখন থেকেই মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিয়ে রাখো।

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের প্রতিটিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আবার এগুলোর প্রত্যেকটির কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সাওম ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ। সাওমেরও রয়েছে কিছু স্বাতন্ত্র্য। প্রিয় শিক্ষার্থী! এ শ্রেণিতে তুমি সাওমের বিস্তারিত ধারণা ও তাৎপর্য, প্রকারভেদ, সাওমের কাযা আদায়ের নিয়ম, সাওমের কাফফারাহ আদায়, সাওম-সংশ্লিষ্ট কতিপয় জরুরি মাসায়েল, ইতিকাফ, সাদাকাতুল ফিতর সম্পর্কে জানতে পারবে। অধিকন্তু তুমি মানবতার গুণাবলি বিকাশে সাওমের ভূমিকা জেনে সে অনুসারে জীবন গঠন করতে পারবে। তাহলে শুরু করা যাক নতুন বিষয়ের আলোচনা।

সাওমের ধারণা

'সাওম' আরবি শব্দ। এর ফার্সি প্রতিশব্দ হলো রোযা। এর আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়- সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিয়তের সাথে পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকাকে সাওম বা রোযা বলে। রমযান মাসের রোযা পালন করা প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমানের উপর ফরয। এটি ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের একটি। যে তা অস্বীকার করবে সে কাফির হবে। বস্তুত রোযা পালনের বিধান পূর্ববর্তী সকল উম্মতের জন্য অপরিহার্য ইবাদাত ছিল। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেছেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۙ

অর্থ: 'হে ইমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হলো, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপর, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৩)

সিয়াম সাধনার ফলে সমাজের লোকদের মাঝে পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি হয়। ধনীরা গরিবদের অনাহারে, অর্ধাহারে জীবনযাপনের কষ্ট অনুধাবন করতে পারে। ক্ষুধা ও পিপাসার যন্ত্রণা যে কীরূপ পীড়াদায়ক হতে পারে তা তারা উপলব্ধি করতে পারে। ফলে তাদের মাঝে অসহায় নিরন্ন মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতার ভাব জাগ্রত হয়। এ কারণে তারা দান-খয়রাতে উৎসাহিত হয়। রমযান মাসে রাসুলুল্লাহ (সা.) অন্যদের দান-সাদকা করতে যেমন উদ্বুদ্ধ করেছেন, তিনি নিজেও তেমনিভাবে খুব দান-সাদকা করতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'রাসুলুল্লাহ (সা.) লোকদের মধ্যে অধিক দানশীল ছিলেন। বিশেষ করে রমযান এলে তাঁর দানশীলতা আরও বেড়ে যেত।' (বুখারি ও মুসলিম)

রোযার গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারি এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে, তারা যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে।' (সূরা আল বাকারা, আয়াত ১৮৫) এতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, রমযান মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে বলে এটি একটি অতি পবিত্র মাস। হাদিসে কুদসিতে আছে–

اَلصَّوْمُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهٖ

অর্থ: 'রোযা কেবল আমারই জন্য। আমি নিজেই এর প্রতিদান দেবো।' (বুখারি)

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'জান্নাতে রাইয়ান নামক একটি দরজা আছে। কিয়ামতের দিন সিয়াম পালনকারী ব্যতীত অন্য কেউ এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না।' (বুখারি) রাসুলুল্লাহ (সা.) আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি ইমানের সাথে এবং আখিরাতে সাওয়াবের আশায় সাওম পালন করে, তার অতীত জীবনের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।' (বুখারি ও মুসলিম)।

রমাযান মাস ধৈর্যের মাস। আর ধৈর্যের বিনিময় হচ্ছে জান্নাত। এ মাসে মুমিনের রিযিক বাড়িয়ে দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি কোনো রোযা পালনকারীকে ইফতার করাবে, সে তার রোযার সমান সাওয়াব পাবে। অথচ রোযা পালনকারী ব্যক্তির সাওয়াবের বিন্দুমাত্র ঘাটতি হবে না। ফযিলতের দিক দিয়ে রমযান মাসকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অংশ রহমতের, দ্বিতীয় অংশ মাগফিরাতের এবং শেষ অংশ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার।

রোযা পালনের মাধ্যমে মানুষ হিংসা, বিদ্বেষ, পরনিন্দা, ধূমপানে আসক্তি ইত্যাদি বদ অভ্যাস ত্যাগ করতে পারে। কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে আত্মরক্ষার হাতিয়ার হলো রোযা। রোযা পালনের মাধ্যমে পানাহারে নিয়মানুবর্তিতার অভ্যাস গড়ে ওঠে। এতে অনেক রোগ দূর হয়। স্বাস্থ্য ভালো থাকে, ফলে মনও ভালো থাকে।
সুতরাং আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় এবং এর নানাবিধ গুরুত্ব বিবেচনা করে আমাদের সাওম পালন করা উচিত। আমরা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে সাওম পালন করব।

সাওমের (রোযার) প্রকারভেদ

সাওম (রোযা) ছয় প্রকার। ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব, নফল ও মাকরুহ।

১. ফরয রোযা : রমযান মাসের রোযা রাখা ফরয। এর অস্বীকারকারী কাফির। রমযানের কাযা রোযা এবং সকল প্রকার কাফফারার রোযাও ফরয।

২. ওয়াজিব রোযা : কোনো নির্দিষ্ট দিনে রোযা রাখার মানত করলে সেই দিনের রোযা রাখা ওয়াজিব। যেমন– কেউ মানত করল যে, বৃহস্পতিবার রোযা রাখবে। অনুরূপভাবে নির্দিষ্ট দিনের উল্লেখ না করে রোযা রাখার মানত করলে সেই রোযা রাখাও ওয়াজিব। এমনকি নফল রোযা রেখে ভেঙ্গে ফেললে তা কাযা করা ওয়াজিব।

৩. সুন্নত রোযা : মহানবি (সা.) যে সকল রোযা পালন করেছেন এবং অন্যদের পালন করতে উৎসাহিত করেছেন, সেগুলো সুন্নত রোযা। যেমন– আশুরার দিন ও আরাফার দিনে রোযা পালন করা সুন্নত।

৪. মুস্তাহাব : প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা পালন করা মুস্তাহাব। এগুলোকে আইয়ামে বীযের রোযা বলা হয়। এ ছাড়া সপ্তাহের প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার এবং শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা পালন করাও মুস্তাহাব।

৫. নফল রোযা : ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাব ছাড়া সকল প্রকার রোযা নফল। নফল অর্থ অতিরিক্ত। যে সকল দিনে রোযা পালন করা শরীয়তে হারাম ও মাকরুহ ঐ সকল দিন ব্যতীত বছরের অন্য যেকোনো দিন রোযা পালন করা নফল।

৬. মাকরুহ রোযা : মাকরুহ দুই প্রকার।

১. মাকরুহ তাহরিমি : যা মূলত হারাম রোযা। যেমন- দুই ঈদের দিনে ও আইয়ামে তাশরিকের অর্থাৎ জিলহজ্জ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে রোযা পালন করা হারাম।

২. মাকরুহ তানযিহি : মুহাররম মাসের ৯ বা ১১ তারিখে রোযা না রেখে শুধু আশুরার দিন আর্থাৎ ১০ তারিখে রোযা পালন করা মাকরুহ তানযিহি। কারণ, এতে ইয়াহুদিদের সাথে সামঞ্জস্য হয়। অনুরূপভাবে শুধু শনিবার রোযা রাখা। কারণ, এতেও ইয়াহুদিদের সাথে মিল হয়ে যায়। মাকরুহ তানযিহি অর্থ চলনসই অপছন্দনীয় কাজ, যা করলে গুণাহ নেই।

সাহরি

‘সাহরি’ আরবি শব্দ। এর অর্থ ভোর রাতের খাবার। ইসলামের পরিভাষায়, সাওম পালন করার উদ্দেশ্যে সুবহে সাদিকের পূর্বে যে খাবার ও পানীয় গ্রহণ করা হয়, তাকে সাহরি বলে। সাহরি খাওয়া সুন্নাত। রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজে সাহরি খেতেন এবং অন্যদেরকেও সাহরি খাওয়ার জন্য তাগিদ করতেন। মহানবি (সা.) বলেছেন, ‘তোমরা সাহরি খাও। কেননা এতে তোমাদের জন্য বরকত রয়েছে।’ (বুখারি)

সুবহে সাদিকের আগেই সাহরি খাওয়া শেষ করতে হবে। কোনো কোনো মানুষ মনে করে– আযান না হওয়া পর্যন্ত খাওয়া জায়েয, এটি একটি মারাত্মক ভুল ধারণা। তবে এত আগেও সাহরি খাওয়া উচিত নয় যে, সাহরি খাওয়ার পর সুবহে সাদিকের অনেক সময় বাকি থাকে। ফলে অনেকে বিশ্রামের জন্য বিছানায় যায় এবং ঘুমিয়ে পড়ে। এতে ফজরের সালাত কাযা হয়ে যায়।

ইফতার

ইফতার আরবি শব্দ। এর অর্থ ভঙ্গ করা, ছিঁড়ে ফেলা, রোযা ভঙ্গকরণ। ইসলামি পরিভাষায় নিয়ত সহকারে সূর্যাস্তের পর হালাল বস্তু পানাহারের মাধ্যমে রোযা ভঙ্গ করাকে ইফতার বলা হয়।
রমজান মাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত হলো ইফতার। এতে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়। ইফতারের সময় হওয়ার সাথে সাথে ইফতার করা উত্তম। হাদিসে কুদসিতে আছে মহান আল্লাহ বলেন– আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় ঐ বান্দাগণ যারা বিলম্ব না করে ইফতার করে। ইফতারের সময় বিসমিল্লাহ বলে শুরু করা এবং আলহামদুলিল্লাহ বলে শেষ করা উত্তম। তবে নিম্নোক্ত দোয়াটিও পড়া যায়:

أَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

অর্থ: ‘হে আল্লাহ ! আপনার জন্য সাওম পালন করেছি এবং আপনার দেওয়া রিযিক দ্বারাই ইফতার করলাম।’ (আবু দাউদ)

অন্যকে ইফতার করানো অনেক সাওয়াবের কাজ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন–‘যে ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে ইফতার করাবে তার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে, সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে। রোযাদারের সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে তবে রোযাদারের সাওয়াবের কোন কম করা হবে না।’ (তিরমিযি)

‘সামান্য এক চুমুক দুধ বা একটি শুকনা খেজুর অথবা এক ঢোক পানি দ্বারাও যে ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে ইফতার করাবে আল্লাহ তাকে রোযাদারের সমপরিমাণ সাওয়াব দান করবেন, আর যে ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে পরিতৃপ্তভাবে পানি পান করাবে আল্লাহ তাকে আমার হাওযে কাওসার থেকে এমন পানীয় পান করাবেন, যার ফলে সে জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে তৃষ্ণার্ত হবে না।’ (তিরমিযি)

আমরা অধিক সাওয়াব ও আল্লাহর রহমতের আশায় সময়মতো ইফতার করব এবং অন্যকে ইফতার করাব।

সাওম ভঙ্গের কারণসমূহ

যেসব কারণে সাওম বা রোযা ভেঙে যায় সেগুলো হলো–

১. ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে বা কেউ জোরপূর্বক কোনো কিছু খাওয়ালে;
২. ধোঁয়া, ধূপ ইত্যাদি নাক বা মুখ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করালে;
৩. ধূমপান বা হুক্কা পান করলে;
৪. ছোলা পরিমাণ কোনো কিছু দাঁতের ফাঁক থেকে বের করে গিলে ফেললে;
৫. ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ভরে বমি করলে;
৬. কোনো অখাদ্যবস্তু গিলে ফেললে;
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে ওষুধ সেবন করলে; খেলে বা পান করলে;
৮. রাত বাকি আছে ভেবে নির্দিষ্ট সময়ের পর সাহরি খেলে;
৯. ইফতারের সময় হয়ে গেছে মনে করে সূর্যাস্তের আগে ইফতার করলে;
১০. কুলি করার সময় হঠাৎ করে পেটের ভিতর পানি প্রবেশ করলে;
১১. বৃষ্টির পানি মুখে পড়ার পর পান করলে;
১২. ভুলক্রমে পানাহার করে সাওম নষ্ট হয়ে গেছে মনে করে আবার পানাহার করলে।

যাদের জন্য রোযা রাখা বাধ্যতামূলক নয়

অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং সুস্থ মস্তিস্কসম্পন্ন নয়-এমন কারও জন্যই রোযা ফরয বা বাধ্যতামূলক নয়।

সাওম মাকরুহ হওয়ার কারণ

সাওম মাকরুহ হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে। নিচে কিছু কারণ উল্লেখ করা হলো–

১. গিবত বা পরনিন্দা করলে;
২. মিথ্যা কথা বললে, অশ্লীল আচরণ কিংবা গালমন্দ করলে;
৩. গলা শুকিয়ে যাওয়ার কারণে বারবার কুলি করলে;
৪. কুলি করার সময় গড়গড়া করলে। কারণ, এতে পানি গলার ভিতরে প্রবেশ করে রোযা ভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা থাকে;
৬. সন্দেহের সময় পর্যন্ত বিলম্ব করে সাহরি খেলে;
৭. সময়মত ইফতার না করে বিলম্বে ইফতার করলে।

সাওমের (রোযার) কাযা ও কাফফারা

কাযা

আরবিতে কাযা অর্থ কোনো কর্তব্য যথাসময়ের পরে পালন করা। কোনো অনিচ্ছাকৃত কারণে যদি সাওম ভেঙে যায় কিংবা অসুস্থতা বা কোনো ওজরের কারণে সাওম পালন করা না হয়, এসব ক্ষেত্রে পরবর্তী সময়ে একটি সাওমের পরিবর্তে একটি সাওমই পালন করতে হয়। একে কাযা সাওম বলে।

সাওম কাযা করার কারণসমূহ

১. সাওম পালনকারী রমযান মাসে অসুস্থ হলে, সফরে থাকলে, নারীদের ক্ষেত্রে 'মাসিক চক্র' শুরু হলে অথবা অন্য কোনো ওজরের কারণে সাওম পালনে অপারগ হলে।
২. রাত আছে মনে করে সুবহি সাদিকের পরে পানাহার করলে। অনুরূপভাবে সূর্যাস্ত হয়ে গেছে মনে করে সূর্যাস্তের পূর্বে ইফতার করলে।
৩. ইচ্ছাকৃতভাবে মুখভরে বমি করলে।
৪. জোরপূর্বক রোযাদারকে কেউ কিছু খাওয়ালে।
৫. কুলি করার সময় কিংবা গোসলের সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে পানি পেটে চলে গেলে।
৬. ভুলক্রমে কোনো কিছু খেয়ে ফেললে রোযা ভঙ্গ হয়ে গেছে মনে করে পুনরায় খেলে।
৭. দাঁতের ভিতরে আটকে থাকা ছোলা বুট পরিমাণ কোনো বস্তু বের করে খেয়ে ফেললে।

কাফফারা

ইচ্ছাকৃতভাবে সাওম পালন না করলে বা সাওম রেখে বিনা কারণে ভেঙ্গে ফেললে কাযা ও কাফফারা উভয়ই ফরজ হয়।

সাওমের কাফফারা

সাওমের জন্য কাফফারা হলো নিম্নরূপ–

১. একাধারে দুই মাস সাওম পালন করা। একাধারে কাফফারার সাওম আদায়কালে যদি কোনো কারণে দুই-একদিন বাদ পড়ে যায়, তাহলে পূর্বের সাওম বাতিল হয়ে যাবে। পুনরায় প্রথম থেকে শুরু করে দুই মাস বিরতিহীনভাবে সাওম পালন করতে হবে।
২. একাধারে দুই মাস সাওম পালনে অক্ষম হলে ষাটজন মিসকিনকে পরিতৃপ্তির সাথে দুই বেলা খাওয়ানো। অথবা আহার না করিয়ে ষাটজন মিসকিনকে সদাকায়ে ফিতর সমপরিমাণ খাদ্যদ্রব্য দিয়ে দেওয়া যাবে। এমনিভাবে এর সমপরিমাণ মূল্য দিয়ে দেওয়াও জায়িয।

অথবা

৩. একজন দাসকে স্বাধীন করে দেওয়া।

মানবতার গুণাবলি বিকাশে সাওমের ভূমিকা

সিয়াম মানুষের মাঝে মানবতাবোধ বৃদ্ধি করে। রোযার প্রকৃত শিক্ষা গরিব ও দুঃখী মানুষের কষ্ট বুঝতে পারা। গরিব ও অসহায় মানুষ না খেয়ে থাকে ও অনেক কষ্ট করে থাকে। ক্ষুধার্ত অবস্থায় মানুষের কেমন কষ্ট হয় তা অনুধাবন করতে পারে একজন রোযাদার ব্যক্তি। যার ফলে সে দানশীল হবে ও অভাবী মানুষকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে। রোযার মাসে ধনী-দরিদ্র একত্র হয়ে তারাবীর নামায আদায় করে। কোনো কোনো সময় একত্রে ইফতার করে যার মধ্য দিয়ে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায়। এক মানুষ অপর মানুষের প্রতি দয়া, মায়া, উদারতা, সেবা ও ভালোবাসার শিক্ষা পেয়ে থাকে। মানুষ রোযা রেখে কম কথা বলে। যার ফলে অশালীন কথা-বার্তা কম হয়ে থাকে। রোযার মাসে ঝগড়া-বিবাদ ও কলহ কম হয়ে থাকে। রোযা মানুষের কুপ্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে । যার ফলে সামাজিক অপরাধ কম হয়। রোযার মাসে মানুষ ভালো কাজের চর্চা করে থাকে। এর ফলে সমাজে ভালো কাজের পরিধি বৃদ্ধি পায়। সহনশীলতা রোযার অন্যতম শিক্ষা। রোযার মাসে একে অপরের প্রতি সহনশীল আচরণ করে থাকে। সাওম যে কোনো কাজে সহনশীল হওয়ার শিক্ষা দেয়।

দলগত কাজ :

১. শিক্ষার্থীরা সাওমের কাযা ও কাফফারার কারণ একটি পোস্টারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।
২. শিক্ষার্থীরা সাওমের কাফফারা আদায়ের পদ্ধতি নিয়ে পরস্পরে মধ্যে আলোচনা করবে।

ইতিকাফ

‘ইতিকাফ’ আরবি শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ হলো আটকে থাকা, কোথাও অবস্থান করা। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় ইতিকাফ হচ্ছে- জামাআতে সালাত অনুষ্ঠিত হয় এমন মসজিদে সাওম পালনরত অবস্থায় ইতিকাফ এর নিয়তে অবস্থান করা। যিনি ইতিকাফ পালন করেন তাকে ‘মুতাকিফ’ বলে। ইতিকাফের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে নির্দেশনা রয়েছে যেমন মহান আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘এবং ইবরাহিম ও ইসমাইলকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী, রুকু ও সিজদাকারীদের জন্য আমার গৃহকে পবিত্র রাখতে আদেশ দিয়েছিলাম।’ (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১২৫) মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) রমযানের শেষ দশ দিন সবর্দা ইতিকাফ করতেন।

ইতিকাফের তাৎপর্য

ইতিকাফের লক্ষ্য হচ্ছে দুনিয়াদারির কোলাহল মুক্ত থেকে নিবিড়ভাবে ধ্যান অনুধ্যান করে মহান আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভ করা। এছাড়া-‘লাইলাতুল কদর’ হলো হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও বরকতময়। সুতরাং এই রাতের মর্যাদা হাসিলের লক্ষ্যে রাসুলুল্লাহ (সা.) ইতিকাফ পালন করতেন। যেমন হাদিসে বর্ণিত আছে ‘রাসুল (সা.) প্রতি রমযানের শেষ দশ দিন ইতিকাফ পালন করতেন। এ আমলটি তাঁর ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। মহানবি (সা.) এর ওফাতের পর তার বিবিগণ ও এই নিয়মে (ইতিকাফ) পালন করতেন।’ (বুখারি)

ইতিকাফ পালনের নিয়মাবলি ও জরুরি মাসায়েল

১. ইতিকাফের নিয়তে রমযান মাসের ২০ তারিখ আসরের পরে সূর্যাস্তের আগে মসজিদে প্রবেশ করতে হয় আর ২৯ বা ৩০ তারিখে শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা গেলে ইতিকাফ শেষ করতে হয়।

২. শরিয়ত সম্মত প্রয়োজন অথবা মানবীয় প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ থেকে বের হলে ইতিকাফ ভঙ্গ হয়ে যায়। শরিয়ত সম্মত প্রয়োজন বলতে প্রয়োজনে জুমার নামাযে শরিক হতে বের হওয়া আর মানবীয় প্রয়োজন বলতে পায়খানা বা প্রস্রাব করার জন্য বের হওয়া। উল্লেখ্য, জানাজা নামাযে শরিক হওয়ার জন্য মসজিদ হতে বের হওয়া যাবে না।

৩. প্রতি রমযান মাসের শেষ দশকে ইতিকাফ পালন করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আলাল কিফায়া। যদি পাড়া বা মহল্লার যে কোন একজন ইতিকাফ পালন করেন তবে সকলের পক্ষ থেকে ঐ সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আলাল কিফায়া আদায় হবে। কিন্তু কেউ পালন না করলে সকলে গুনাহগার হবে।

সাদাকাতুল ফিতর

ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের সালাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে সাওমের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে গরিব-দুঃখীদের সহযোগিতায় যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ-সম্পদ দান করা হয়, তাকে সাদাকাতুল ফিতর বলে। একে 'যাকাতুল ফিতর' ও বলা হয়।

মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ (সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন ভরি রৌপ্য বা সমপরিমাণ অর্থ প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকলে তাকে নিসাব বলে) সম্পদের মালিক প্রত্যেক স্বাধীন মুসলিম নর-নারীর উপর 'সাদাকাতুল ফিতর' ওয়াজিব। শিশু ও নির্ভরশীল ব্যক্তির সাদাকা অভিভাবক আদায় করবে।

তাৎপর্য

মুসলমানগণ পবিত্র রমযান মাসে রোযা পালন করেন। পবিত্র রমযান মাসে রোযা পালনের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার প্রতি যে অফুরন্ত নিয়ামত দান করেন, তার শুকরিয়া হিসেবে এবং রোযা পালন কালে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়, তার ক্ষতিপূরণের জন্য 'সাদাকাতুল ফিতর' ওয়াজিব করা হয়েছে। সাদাকাতুল ফিতর পেলে গরিব-অনাথ লোকেরাও ঈদের খুশিতে অংশীদার হতে পারে। এভাবেই ধনী-গরিবের মধ্যে ব্যবধান কমে আসে এবং সম্প্রীতি ও সৌহার্দ গড়ে ওঠে। হাদিসে আছে,

فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ

অর্থ: 'রাসুলুল্লাহ (সা.) যাকাতুল ফিতর আবশ্যক করেছেন রোযাদারকে অর্নথক কথা ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্র করার জন্য ও মিসকিনদের খাদ্যের ব্যবস্থা করার নিমিত্তে' (আবু দাউদ)

আদায়ের নিয়ম

ঈদের সালাতের পূর্বে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকের সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব। ঈদের আগেও 'সাদাকাতুল ফিতর' আদায় করা যায়। তবে ঈদের দিন সালাতের উদ্দেশ্যে ঈদের মাঠে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে 'সাদাকাতুল ফিতর' আদায় করা উত্তম। ঈদের পর কেউ যদি তা আদায় করে তবে আদায় হবে কিন্তু সাওয়াব কম হবে।
গরিব আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী, ফকির-মিসকিনকে সাদাকাতুল ফিতর দেওয়া যাবে। একজনের ফিতরা একাধিক ব্যক্তিকে অথবা একাধিক ব্যক্তির ফিতরা একজনকে দেওয়া যাবে।

সাদাকাতুল ফিতরের পরিমাণ

মাথাপিছু নিসফু সা অর্থাৎ প্রায় পৌনে দুই কেজি গম (১ কেজি ৭৫০ গ্রাম গম) বা তার মূল্য আদায় করতে হবে। তবে গম ছাড়া যদি অন্যকোন জিনিস যেমন- যব, কিসমিস, খেজুর, বা পনির দিয়ে আদায় করলে পূর্ণ এক সা' ৩ কেজি ৫০০ গ্রাম আদায় করতে হবে।

দলগত কাজ: শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে 'সাদাকাতুল ফিতর' আদায়ের গুরুত্বের উপর আলোচনা করবে।

যাকাত

ইসলামি জীবন বিধানের মৌলিক যে পাঁচটি স্তম্ভ রয়েছে যাকাত তন্মধ্যে অন্যতম বুনিয়াদ বা স্তম্ভ। ইমান, সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ্জ এ পাঁচটি বিধান মেনে চলা মুসলমানের জন্য ফরয বা অবশ্যকর্তব্য। এ পাঁচটি বুনিয়াদি বিধানের মধ্যে তিনটি বিধান ইমান, সালাত ও সাওম সকল মুসলমানের উপর ফরয করা হয়েছে। আর বাকি দুটি বিধান যাকাত ও হজ্জ শুধুমাত্র সামর্থ্যবান মুসলমানদের উপর ফরয করা হয়েছে। তাই যাকাত একটি আর্থিক ইবাদাত। প্রিয় শিক্ষার্থী, আজ আমরা ইসলামের এ গুরত্বপূর্ণ স্তম্ভ যাকাত সম্পর্কে জেনে নিই।

যাকাত পরিচিতি

যাকাত একটি আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো পবিত্রতা, বৃদ্ধি, আধিক্য, বরকত ইত্যাদি। যাকাত প্রদান করলে যাকাত প্রদানকারী ব্যক্তির মনে কৃপণতার যে কলুষতা রয়েছে তা দূরীভূত হয়ে মন পবিত্র হয়। তা ছাড়া বিত্তশালীদের সম্পদে দরিদ্রদের যে অধিকার রয়েছে যাকাত প্রদানের মাধ্যমে তা করা হয়। ফলে এর মাধ্যমে তাঁর সম্পদও পবিত্র হয়। যাকাত প্রদান করলে আল্লাহ ঐ ব্যক্তির সম্পদে বরকতদান করেন। এ ছাড়া যাকাত দরিদ্রদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। যাকাত প্রদানের ফলে দরিদ্রদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং সমাজের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়, তাই যাকাত প্রদানের মাধ্যম সম্পদও বৃদ্ধি পায়। এজন্য যাকাতের অন্য অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া।

ইসলামি পরিভাষায় অর্থে যাকাত হচ্ছে শরিয়ত কর্তৃক নিদিষ্ট সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে প্রদান করে মালিক বানিয়ে দেওয়া।

কোনো প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম সম্পদশালী ব্যক্তির নিকট যদি ৭.৫ তোলা স্বর্ণ কিংবা ৫২.৫ তোলা রৌপ্য অথবা এর সমপরিমাণ অর্থ কমপক্ষে এক বছর সঞ্চিত থাকে, তাহলে তাকে তার সম্পদের শতকরা ২.৫ হারে গরিবের ও নিঃস্বদের হক আদায় করতে হয়। এ হক আদায় করার নামই যাকাত । এছাড়া শস্য, পশু, ব্যবসায়িক মাল ইত্যাদির ওপর সুনির্দিষ্ট হারে যাকাতের বিধান রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজিদের বিভিন্ন আয়াতে আমাদেরকে যাকাত প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। এ থেকে যাকাতের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

অর্থ: 'আর তোমরা নামায কায়েম করো এবং যাকাত প্রদান করো।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৪৩)

যাকাত ধনীদের সম্পদে আল্লাহর নির্ধারিত গরিবের অংশ যা প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য বা ফরয। এটি কোনো ধরনের দান বা অনুকম্পা নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۝

অর্থ: 'তাদের (ধনীদের) ধন-সম্পদে অবশ্যই দরিদ্র ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।' (সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত: ১৯)

মহান আল্লাহর এ নির্দেশনার কারণেই যাকাত প্রদান করা ধনীদের কোনো প্রকারের অনুগ্রহ, দয়া বা সহযোগিতা নয়। এটি তাদের সম্পদে অসহায়, গরিব, অভাবী ও নিঃস্বদের হক বা অধিকার। তাই এ হক আদায় করে দেওয়া ধনীদের জন্য অবশ্য কর্তব্য বা ফরয। ধনী ব্যক্তিদের সম্পদ থেকে গরীব ও অসহায়দের এ হক আদায়ের নির্দেশ দিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তোমরা তাদের জানিয়ে দাও যে, মহান আল্লাহ তাদের সম্পদের উপর যাকাত ফরয করেছেন। তোমরা সমাজের সম্পদশালীদের সম্পদ থেকে তা (যাকাত) আদায় করে নিঃস্বদের মাঝে ফিরয়ে দাও।' (বুখারি)

যাকাত এর তাৎপর্য

যাকাত একটি আর্থিক ফরয ইবাদাত। এর উদ্দেশ্য কেবলমাত্র আর্থিক লেনদেন বা ব্যক্তি কিংবা সামষ্টিক পর্যায়ে সাহায্য-সহযোগিতা নয়। এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানুষের মনকে পরিশুদ্ধ করে তাকে শুদ্ধতম মানুষরূপে গড়ে তোলা এবং মহান আল্লাহর ভালোবাসা লাভ করা।

প্রত্যেক স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম ব্যক্তি যার নিসাব পরিমাণ সম্পদ রয়েছে, এমন ব্যক্তিকে যাকাত প্রদান করতে হয়। যাকাত প্রদানকারীর সম্পদে আল্লাহ তা'আলা বরকত দান করেন এবং এর বিনিময়ে আখিরাতে তাকে অফুরন্ত কল্যাণ প্রদান করবেন। হাদিসে কুদসিতে মহান আল্লাহ বলেন, 'হে বনি আদম! আমার পথে খরচ করতে থাকো। আমি আমার অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে তোমাদের দিতে থাকব।' (বুখারি ও মুসলিম)

যাকাত প্রদানকারীর জন্য যেমন পুরস্কার রয়েছে তেমনি যাকাত প্রদানে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্য শাস্তির দুঃসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী, জান্নাতের নিকটবর্তী, আল্লাহর বান্দাদের নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম থেকে দূরবর্তী। অপরদিকে কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ থেকে দূরে, আল্লাহর বান্দাদের থেকে দূরে এবং জাহান্নামের সন্নিকটে। আর একজন জাহিল দানশীল একজন কৃপণ আবেদ অপেক্ষা আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়।' (তিরমিযী)

যারা যাকাত প্রদান করে না কুরআন মাজিদ ও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিসে তাদের জন্য কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর যারা সোনা-রুপা পুঞ্জীভূত করে রাখে, এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে ভয়ানক শাস্তির সংবাদ দিন। সেদিন জাহান্নামের আগুনে তা গরম করা হবে এবং তা দিয়ে তাদের কপালে, পাঁজরে ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, এগুলোই সে সমস্ত সোনা-রুপা, যা তোমরা জমা করতে। কাজেই তোমরা যা জমা করেছিলে তার স্বাদ ভোগ করো।' (সূরা তওবা, আয়াত: ৩৪-৩৫)

সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিতকরণে ইসলাম যে সকল ব্যবস্থা মানুষকে উপহার দিয়েছে, তার অন্যতম হচ্ছে যাকাত। সম্পদের সুষম বণ্টন করা না গেলে সম্পদ কতিপয় মানুষের হাতে পুঞ্জিভূত হয়ে পড়ে। ফলে সমাজে ব্যাপকভাবে অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দেয়। মানুষের অভাব-অনটন বেড়ে যায়, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ও মানুষের নৈতিক অবক্ষয় ঘটে। এসব সমস্যা থেকে মানবজাতিকে রক্ষার লক্ষ্যে মহান আল্লাহ প্রত্যেক সম্পদশালী ব্যক্তির উপর যাকাত অবশ্যপালনীয় বা ফরয করেছেন। তিনি চান এ সম্পদ সুষম বণ্টনের মাধ্যমে যেন মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করা হয়। এ জন্য যারা যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়, তারা কৃপণ এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ

অর্থ: 'মুশরিকদের জন্য শুধুই ধ্বংস, যারা যাকাত আদায় করে না।' (সূরা হা-মীম আস-সাজদা, আয়াত: ৬-৭)]

আল্লাহর আদেশ মান্য করে যাকাত আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। যাকাত প্রদানের মাধ্যম সম্পদ ও মন পবিত্র হয়। তা ছাড়া এর মাধ্যমে সম্পদের প্রবৃদ্ধি ঘটে। যাকাত প্রদানকারীকে আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে অফুরন্ত কল্যাণ দান করেন। পক্ষান্তরে যাকাত অস্বীকারকারীর জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন। তাই আমাদের কর্তব্য হলো, নিজে যাকাত প্রদান করা এবং অন্যকে যাকাত দানে উৎসাহিত করা।

যাকাতের ধর্মীয় গুরুত্ব

যাকাত মুসলমানদের জন্য অবশ্য পালনীয় ইবাদাত। প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমান নর-নারীর ওপর যাকাত ফরয। যাকাত হলো আর্থিক ইবাদাত। যাকাত দানের মাধ্যমে ব্যক্তির উপার্জিত সম্পদ পবিত্র হয়। ধন-সম্পদের মোহ ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। মানুষ তার শরীরের চেয়ে সম্পদকে বেশি ভালোবাসে। এ জন্য মানুষ সম্পদ আহরণের জন্য দিনরাত পরিশ্রম করে। অথচ আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য সেই সম্পদকে দান করে থাকে। তাই যাকাতদানকারী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাত লাভ করবে। অপরপক্ষে যাকাত আদায় না করলে মহাপাপী হবে এবং জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে। একজন মুসলিম স্বেচ্ছায় যাকাত প্রদান করার মাধ্যমে তার ধন-সম্পদের জন্য আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এর ফলে সে আত্মিক শান্তি পায়।
আল-কুরআনের ঘোষণা,

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

অর্থ: ‘তাদের সম্পদ হতে ‘সদকা’ (যাকাত) গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র এবং পরিশুদ্ধ করবে । তুমি তাদেরকে দোয়া করবে। তোমার দোয়া তো তাদের জন্য চিত্ত স্বস্তিকর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।’ (সূরা তওবা, আয়াত-১০৩)

যাকাতের সামাজিক গুরুত্ব

যাকাত আদায়ের মাধ্যমে সমাজে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ, সহৃদয়তা ও সহনশীলতার প্রকাশ ঘটে। অর্থনৈতিকভাবে যারা অস্বচ্ছল তারা আর্থিকভাবে সক্ষম হয়ে থাকে। ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান কমে থাকে। যাকাত দানের ফলে সমাজের গরিব, এতিম, বিধবা, বৃদ্ধ, রুগ্ণ, পঙ্গু, ও অক্ষম ব্যক্তিরা তাদের অভাব দূর করতে পারেন। অর্থের অভাবে মানুষ চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি, ছিনতাই ও সন্ত্রাসের মতো অসংখ্য খারাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে। যাকাতের টাকা এ সকল মানুষকে অভাব থেকে দূরে রাখে এবং অপরাধ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা পালন করে থাকে। এ ছাড়া যাকাতের মাধ্যমে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সমাজে বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজ করা হয়ে থাকে। যার ফলে সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত হয়।

যাকাতের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

সম্পদশালীদের সম্পদ যাকাত আকারে সমাজের দরিদ্র শ্রেণির হাতে আসে। যাকাতের মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরে সম্পদের প্রবাহ গতিশীল হয়। দরিদ্র শ্রেণি যাকাত থেকে প্রাপ্ত অর্থ উৎপাদনের কাজে লাগিয়ে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি করে থাকে। অভাবী মানুষ তার অভাব পূরণ করতে পারে। ক্ষুদ্র আয়ের মানুষ যাকাতের অর্থকে পুঁজি হিসেবে গ্রহণ করে নিজের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটিয়ে থাকে। প্রতিবছর যাকাত দেওয়ার মাধ্যমে দারিদ্র্যের হার ক্রমান্বয়ে কমে আসবে।

যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত

যাকাত ফরয ইবাদাত। তবে সকল মানুষের উপর যাকাত বাধ্যতামূলক নয়। যাকাত ফরয হওয়ার শর্তসমূহ নিম্নরূপ-

১. মুসলমান হওয়া;
২. নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া;
৩. নেসাব প্রকৃত প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া;
৪. ঋণগ্রস্ত না হওয়া;
৫. নিসাব পরিমাণ যাকাতের অর্থ সম্পদ মালিকের কাছে কমপক্ষে ১ বছর কাল থাকা।
৬. জ্ঞান-সম্পন্ন হওয়া; এবং
৭. বালেগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) হওয়া।

যাকাতের নিসাব

যাকাত ধার্য হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত হচ্ছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা। 'নিসাব' বলা হয় নির্ধারিত নিম্নতম সীমা বা পরিমাণকে। এই পরিমাণ নির্ধারণে ব্যক্তির সর্বমোট আয় থেকে যাবতীয় ব্যয় বাদ দেওয়ার পর উদ্বৃত্ত অর্থ এবং তার পূর্বের সঞ্চয় ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ যুক্ত হবে। প্রয়োজনীয় ব্যয় বাদে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য বা সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা এর সমমূল্যের সম্পদকে 'নিসাব' বলা হয়। এছাড়াও নগদ টাকার মোট পরিমাণ (হাতে ও ব্যাংকে মিলিয়ে) সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণের বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের দামের সমান হলে তাতেও ২.৫% হিসেবে যাকাত আদায় করতে হবে। এছাড়াও ফসলের যাকাত (উশর), ফল, তরিতরকারি, পশু সম্পদ ইত্যাদির ওপর যাকাতের বিধান আছে।

যাকাত বণ্টনের খাত

যাকাত বণ্টনের খাতসমূহ পবিত্র কুরআনে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ - فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

অর্থ: 'সদকাতো (যাকাত) কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' (সূরা তওবা, আয়াত-৬০)

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ যে আটটি খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছেন তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

১. **ফকির বা দরিদ্র:** ফকির বলতে সেই ধরনের ব্যক্তিদেরকে বোঝায় যারা একেবারে নিঃস্ব নয়। তাদের কিছু সহায় সম্পদ আছে। তবে এত কম যে তা দিয়ে অতি কষ্টে জীবন নির্বাহ করে থাকে। তাদের মৌলিক প্রয়োজন যথা অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা ও বাসস্থানের খরচ নির্বাহ করার মতো সামর্থ্য নেই।

২. **মিসকিন বা নিঃস্ব:** যাদের জীবিকা নির্বাহের কোনো ব্যবস্থা বা নিশ্চয়তা নেই, জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা নেই। দৈহিকভাবে অক্ষম, বাঁচার জন্য অন্যের নিকট হাত পাততে হয়, তাদেরকে মিসকিন বা নিঃস্ব বলা হয়। এ ধরনের সকল প্রকার মিসকিন যাকাত পাবার যোগ্য।

৩. **যাকাত আদায়কারী কর্মচারী:** যে সকল কর্মচারী যাকাত বিভাগে কর্মরত। যারা যাকাত আদায় ও বণ্টনের সামগ্রিক কার্যক্রমের সাথে জড়িত, তাদের বেতন ও অন্যান্য প্রাপ্য যাকাতের অর্থ থেকে দেওয়া যাবে।

৪. **চিত্ত আকর্ষণের জন্য :** যারা নওমুসলিম , কিংবা সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা যাকাত পাওয়ার যোগ্য। ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণে সমাজচ্যুত ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বা দুর্বল ইমান দ্বিধাগ্রস্ত তারা যাকাত পাওয়ার যোগ্য। নওমুসলিম আর্থিকভাবে সক্ষম হলেও তাদের মনকে আকৃষ্ট করার জন্য যাকাত দেওয়া যেতে পারে।

৫. **দাসমুক্তি:** কোনো মুসলমান নর-নারী যদি দুর্ভাগ্যক্রমে দাসত্বের মধ্যে আটকা পড়ে বা বন্দি থাকে তবে তাকে মুক্ত করার জন্য যাকাতের টাকা খরচ করা যেতে পারে।

৬. **ঋণমুক্তি:** ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, যার পক্ষে বৈধ আয় দিয়ে ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব নয় তাদেরকে যাকাত দিয়ে ঋণমুক্ত করা যেতে পারে।

৭. **ফী সাবিলিল্লাহ:** 'ফী সাবিলিল্লাহ' বলতে আল্লাহর পথে খরচ করাকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহর পথে যে সকল কাজ, সে সকল খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে। দ্বীনি ইলম শিক্ষার্থী, আল্লাহর পথে জিহাদকারী কিংবা সৎ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিকে যাকাতের অর্থ দেওয়া যায়।

৮. **মুসাফির:** মুসাফির বলতে ওই ব্যক্তিকে বোঝানো হয়ে থাকে যারা নিজ দেশে ধনী হলেও সফরে এসে নিঃস্ব ও দরিদ্র হয়ে গেছেন। অর্থাৎ পথে বা প্রবাসে সে যদি অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তাকে যাকাতের টাকা সাহায্য হিসেবে দেওয়া যায়।

এই অধ্যায় থেকে তুমি সালাত, সাওম এবং যাকাত সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছ। এই ইবাদাতগুলোর গুরুত্ব সম্পর্কেও ধারণা লাভ করেছ। এই অধ্যায়ের প্রতিটি ইবাদাত ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে যে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা কি তুমি বুঝতে পেরেছ? এখন তাহলে এই ইবাদাতগুলোর শিক্ষাই তোমাকে কাজে লাগাতে হবে। তোমার আশেপাশের মানুষের সহায়তায় এগিয়ে আসতে হবে। কিভাবে তা করবে সেটি শিক্ষক জানিয়ে দিবেন। সঠিকভাবে কাজটি সম্পন্ন করতে পারলে দেখবে তোমার নিজের কাছেই অনেক ভালো লাগছে। তাহলে শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে কাজ করে ফেলো!